আয়ুর্ব্বেদ

আর্য্য চিকিৎসা বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক
মাসিক পত্র ও সমালোচক।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম, এ, এল, এম, এস,
কবিরাজ শ্রীযামিনী ভূষণ রায় কবিরত্ন এম, এ, এম, বি,
কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ,
কবিরাজ শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র কবিরত্ন মহোদয়গণের
অভ্যাবধানে।

কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

৫ম বর্ষ

(সন ১৩২৭ আশ্বিন হইতে ১৩২৮ ভাদ্র পর্য্যন্ত)

কলিকাতা।
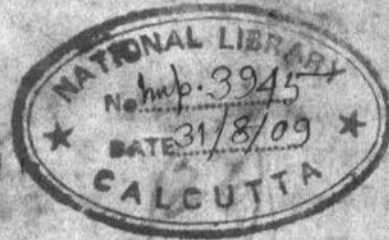
২৯ নং ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট—আয়ুর্ব্বেদ মেডিকেল কলেজ হইতে
কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্র কুমার দাস গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
২০৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট গোবৰ্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩।৶০ আনা।

পঞ্চমবর্ষের প্রবন্ধ সূচী।

(বর্ণমালানুসারে)

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক

৫ম বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৭—আশ্বিন। | ১ম সংখ্যা।

নববর্ষ—মঙ্গলগীতিঃ।

(কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কাব্যতীর্থ কবিভূষণ।)

শিবে ! শিবার্থং শিব আশ্রিত ত্বাং
ত্বং শক্তিরূপাসি জগত্রয়স্য।
সর্ব্বার্থ সিদ্ধৌ নিখিলস্য হেতুঃ
ভূয়াঃ সদানঃকৃপয়া শুভায় ॥

যদিচ্ছয়া বিঘ্নতমো নিরস্য
কল্যাণ ভাস্বান্ সমুদেতি লোকে।
গজেন্দ্রবক্ত্রঃ স মহেন্দ্র বন্দ্যো—
ভূয়াদ্ গণেন্দ্রঃ শিবদঃ সদানঃ ॥

দৃষ্ট্বা ধরাং ব্যাধিকৃশানুদগ্ধাং
বতীর্য্য কাশীপতি-রূপতোষঃ।
কৃপামৃতৈঃ বৈদ্যক-বৃত্তিধাতা
চকার শান্তাং স শিবোঽস্তুভূত্যৈ ॥

"আয়ুর্ব্বেদ-মহাসিন্ধু-নিমগ্নরত্নসঞ্চয়ং।
"আয়ুর্ব্বেদঃ" সমাহৃত্য করোতু জগতো হিতং ॥"

বাঙ্গালীর মরণের যৎকিঞ্চিৎ।

বাঙ্গালী যত মরে এমন আর পৃথিবীর কোন দেশের লোক মরে না। বাঙ্গালা দেশের পল্লীগুলিতে হাজার করা ত্রিশ জনেরও অধিক লোক প্রতি বৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে যত শিশু জন্মে, তাহার মধ্যে প্রতি মিনিটে চারিটি করিয়া শিশু অকালে কালকবলিত হয়। ভগবানের রাজ্যে কোনো দেশে এমন মৃত্যুর ব্যবস্থা নাই। কাজেই বলিতে হইবে, বাঙ্গালীর কর্ম্মফলে বাঙ্গালী জাতির মরণাধিক্য এইরূপ ভাবে সংঘটিত হইতেছে।

সত্য সত্যই বাঙ্গালী জাতির কর্ম্মফলই বাঙ্গালীর মৃত্যু-বাহুল্যের কারণ। ধর্ম্ম পালনে মোক্ষের পথ পরিষ্কৃত হয় কিনা—ধর্ম্মপ্রাণ হইয়া চিরজীবন অতিবাহিত করিতে পারিলে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হয় কিনা—সে সব জটিল বিষয়ের মীমাংসা এখানে করিতে চাহিনা; কিন্তু হিন্দুর করণীয় ধর্ম্মগুলিই যে স্বাস্থ্যরক্ষার সহিত সুসম্বদ্ধ—তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হিন্দুর প্রাত্যহিক কর্ম্ম হইতে নৈশ-যাপন পর্য্যন্ত সকল ব্যবস্থার মূলেই স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় সকল বিধিবদ্ধ। অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ, নদীর স্বচ্ছসলিলে অবগাহনের ব্যবস্থা, পূজা উদ্দেশে পুষ্পচয়নের জন্য পুষ্পবাটিকায় পরিভ্রমণ—এ সকল যে স্বাস্থ্যোন্নতির সহায়তা করে—তাহা কি আর বলিতে হইবে? ইষ্টমূর্ত্তির কল্পনা করিয়া লইয়া তাঁহার আরাধনায় কাহারও সালোক্য-সাযুজ্য লাভ ঘটিয়া থাকে কিনা জানিনা, কিন্তু তাহাতে যেরূপ চিত্তশুদ্ধি হয়—সেরূপ চিত্তশুদ্ধি যে অবিরত কর্ম্ম তাড়নায় বিপর্য্যস্ত মনুষ্যজাতির ভাগ্যে আর কোনরূপে ঘটিতে পারে না—তাহা সুনিশ্চিত। যাঁহারা নানারূপ বিলাস-তুষারে অঙ্গ ঢালিয়া সর্ব্বদা রঙ্গরসে মজ্জ হইয়া আনন্দ সুখ উপভোগ করেন, তাঁহারা একদিনের জন্যও কিয়ৎকাল ভগবদারাধনায় মনোনিবেশ করিলে, তাহার তৃপ্তিসুখ যে কামিনী-কাঞ্চনের সুখ-সৌভাগ্য অপেক্ষা অধিক আরামপ্রদ—তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। কল্পনায় ইহার নির্ণয় করা দুরূহ, সুকৃতির ফলে যাঁহারা সেরূপ সৌভাগ্য লইয়া জন্মগ্রহণ না করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার সুখ ধারণা করিতে পারিবেন না।

যাক্ সে কথা। এখন বাঙ্গালী মরিতেছে নিজের কর্ম্মফলে—ইহাই আলোচ্য প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিব। বাঙ্গালীর শিশুমৃত্যুর সর্ব্বপ্রধান কারণ যেরূপ বয়ঃ বিচার করিয়া স্ত্রীপুরুষের মিলনে দীর্ঘায়ু ও স্বাস্থ্যবান সন্তান লাভের সম্ভাবনা, এখনকার বাঙ্গালীর মধ্যে তাহা লোপ পাইয়াছে। ষোড়শ বর্ষীয়া রমণী ও পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স্ক পুরুষের মিলনই গর্ভাধানের উপযুক্ত কাল শাস্ত্রকার আদেশ দিয়াছেন। অষ্টমবর্ষে গৌরীদানের ব্যবস্থাও হিন্দু ঘোষণা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সে গৌরীদান সমাপ্তির পরেই যে হরগৌরীর নিভৃত মিলনের ব্যবস্থা করিতে হইবে—এমন

কথা হিন্দুশাস্ত্রকার কখনো ঘোষণা করেন নাই। বরং মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন,—

উন ষোড়শ বর্ষায়াম প্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিঃ।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥
জাতো বা ন চিরংজীবেজ্জ বেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্তবালায়ং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥

অর্থাৎ—যদি ষোল বৎসরের কম বয়সের কন্যা ও পঁচিশ বয়সের কম বয়সের যুবক গর্ভাধান করে, তাহা হইলে সেই গর্ভস্থ সন্তান গর্ভ মধ্যেই বিনষ্ট হয়, আর তাহা না হইয়া সেই সন্তান যদি ভূমিষ্ট হয়, তাহা হইলে সে সন্তান দীর্ঘজীবি হয় না অথবা সে যদি বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার ইন্দ্রিয় সকল দুর্ব্বল হয়। অতএব কন্যার গর্ভাধানযোগ্য বয়স না হইতেই তাহাতে অল্পবয়স্ক পুরুষের গর্ভাধান কখনই কর্ত্তব্য নহে।

কিন্তু এ কর্ত্তব্য যে এখন আমাদের সমাজে সর্ব্বদা প্রতিপালিত হয় না, তাহা তো আর বলিতে হইবে না। সেকালে যখন গৌরী-দানের ব্যবস্থা ছিল, তখন এখনকার মত কন্যাপণ অপ্রতিহত প্রভাবে বাঙ্গালী-সমাজে বিস্তার লাভ করে নাই। বল্লালসেনের কৃপায় যে সময়ে কৌলিন্যপ্রথার সৃষ্টি হইয়া কুসুমকোমলপ্রাণা বঙ্গমহিলার সর্ব্বনাশের কারণ উপস্থিত হইয়াছিল,—'কুলের মুকুট'র দোহাই দিয়া যে সময় বঙ্গমহিলাকে আজীবন কুমারী আখ্যায় অভিহিতা রাখিয়া তাহার রমণীজন-লালসার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা বাঙ্গালী সমাজ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিত না, বাঙ্গালীর সর্ব্বসর্ব্বস্ব সমাজপতিগণ যে সময় ঐরূপভাবে চির নিপীড়িতা কামিনী-গণকে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহার কুমারী আখ্যা অপনোদনোদ্দেশে কুক্কুর বিড়ালের গলদেশে মাল্যদানের ব্যবস্থায় তাহাকে 'সধবা' করার বন্দোবস্ত করিতেন, তখনো কুলীনদিগের মধ্যে ঐরূপ ঘৃণিত ও বীভৎসপ্রথা প্রচলিত থাকিলেও অন্যান্য সমাজের বাঙ্গালীগণ স্ত্রী লাভ যে একটা সৌভাগ্যের বিষয় তাহা স্বীকার করিত। সেইজন্য সেকালে কন্যা-দানে কন্যার পিতাকে পণ দিবার জন্য পীড়ন করা হইত না। সালঙ্কারা কন্যা দান অবশ্য শাস্ত্রীয় বিধি, কিন্তু সে সালঙ্কারা শব্দের অর্থ সঙ্গতি হিসাবে ধরিয়া লওয়া হইত। অনেক সমাজে আবার কন্যালাভের জন্য কন্যাপক্ষকে অর্থ দিতে হইত, অবশ্য সে ব্যবস্থাও সমীচীন নহে, যাহা হউক আসল কথা, তখন সমাজে এরূপ পণ প্রথার ব্যবস্থা না থাকায় বয়ঃ বিচারের ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সমাজে বিবাহ কার্য্য সুসিদ্ধ হইত।

অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়ার কুফল কিছু কিছু থাকিতে পারে, অল্প বয়সে বিবাহ দিলে যদি বিবাহের পরই কন্যার স্বামী-বিয়োগ হয়, তাহা হইলে তাহাকে সমাজের কঠোর শাসনে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার জন্য ভীষণ ভাবে নিগৃহীতা হইতে হয় ইহা সত্য, কিন্তু অপর দিকে অল্প বয়সে বিবাহের ফলে বাল্য জীবনেই সে একটু একটু করিয়া স্বামীর সংসার চিনিতে পারে। স্বামী এবং স্বামীর সংসার উপলব্ধি করার ফলে যৌবনোন্মুখী তীব্র লালসার স্ফুরণের জন্য তাহার আর পথভ্রষ্টা হইবার কোনও আশঙ্কা থাকেনা। তা' ছাড়া যদি সে কন্যা 'বিষকন্যা' হয়, তাহা হইলে অল্প বয়সে বিবা-হের ফলে তাহার বিষ এত ধীর মন্থর ভাবে

স্বামীর অঙ্গে মিশ্রিত হয় যে, নিত্য অহিফেন অভ্যাসীর মত সে বিষে তাহার অনিষ্ট হয় না। এই বিষকন্যার ইতিবৃত্ত ইতঃপূর্ব্বে ২য় বর্ষের ২য় ও ৬ষ্ঠ সংখ্যক "আয়ুর্ব্বেদে" পণ্ডিত রাম সহায় কাব্যতীর্থ বেদান্ত শাস্ত্রী মহাশয় "বাল্য-বিবাহের বৈজ্ঞানিক যুক্তি" প্রবন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন, অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ তাঁহার সেই প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

পুরুষের পক্ষেও বাল্যবিবাহ ইষ্টকর। তাহার ফলে যৌবন-তাড়িত-উদ্দাম-চপল অশান্ত প্রবৃত্তি কুপথে ধাবিত হইতে পারে না। এমন একটা আকর্ষণী শক্তি অন্তর মধ্যে নিহিত থাকে—যাহাতে সেই শক্তির অপচয় করিতে স্বভাবতঃই কেহ সক্ষম হয় না। তবে অলোক সামান্যা চম্পকবিনিন্দিতা রূপসী রমণী লাভ করিয়াও যাহারা বারবনিতার সঙ্গলাভই জীবনের শ্রেয়ঃ বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছে—তাহাদিগকে আমরা নর-জগতের দৈত্য দানব ভিন্ন আর কোনো আখ্যাই প্রদান করিতে সমর্থ নহি।

স্ত্রী পুরুষ—সকলের পক্ষেই অল্প বয়সে বিবাহের ব্যবস্থা মন্দ নহে, কিন্তু তাহার সহিত ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা লাভ চাই। শাস্ত্রকারগণ ষোড়শ বর্ষীয়া রমণীর সহিত পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় যুবকের মিলনের ব্যবস্থার যে আদেশ করিয়াছেন, তাহা পালন করিতে হইবে, কিন্তু অল্প বয়সে বিবাহ দিলেই যে ব্রহ্মচর্য্য পালনের অন্তরায় ঘটাইতে হইবে—তাহার কথাতো শাস্ত্রকারগণ বলেন নাই। কিন্তু এখন সে ব্রহ্মচর্য্যও নাই, স্ত্রীপুরুষের বয়ঃবিচারের পার্থক্য রাখিয়াও বিবাহ দেওয়ার রীতি নাই। পণ-পীড়নে এখনকার সমাজ যেরূপ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে কন্যা পক্ষে অনেকের বিবাহ হয় তো শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট গর্ভাধানের উপযুক্ত কালেই সংঘটিত হয়, কিন্তু স্বামীর সহিত বয়সের পার্থক্য অনেক স্থলেই উপযুক্ত ভাবে রক্ষিত হয় না। ষোড়শ বর্ষীয়া কামিনী এবং বিংশতি বর্ষীয় যুবকের মিলন—এখন অনেক স্থলেই হইয়া পড়িতেছে। সে অবস্থায় তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ যে মরণের পথ প্রতি মিনিটে চারিটি করিয়া পরিষ্কার করিবে, তাহাতে আর কথা কি? অনেক সময় রমণীদিগের গর্ভাধানের অনুপযুক্ত কালেও গর্ভাধানের ফলে এই মরণের পথ পরিষ্কার করা হয়। আমরা এখন অর্থকেই সার সর্ব্বস্ব করিয়াছি, কাজেই পুত্রের বিবাহের সময় তাহার ভবিষ্যৎ শুভাশুভের দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন নাই! যে কন্যার পিতা আমার পাসকরা পুত্রের জন্য অধিক যৌতুক প্রদান করিবেন, তাঁহার সহিতই আমি বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিব,—কাজেই আমার বংশক্ষয় ঘটিবেনা কেন?

কথা কথা, বাঙ্গালা দেশে শিশুমৃত্যু বাহুল্যের সর্ব্ব প্রধান কারণ—বাঙ্গালী সমাজে এখনকার দিনে বয়ঃবিচারের ব্যবস্থা না রাখিয়া পুত্র কন্যার বিবাহ দেওয়া এবং তাহাদিগকে বাল্য জীবনে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষায় বঞ্চিত রাখিয়া তাহাদিগের যৌবনস্বভাবসুলভ ইন্দ্রিয় বৃত্তির অযথা চরিতার্থ করিবার সুবিধা প্রদান করা। যথাসময়ে উর্ব্বর ক্ষেত্রে অক্ষত বীজ বপনে যেরূপ উৎকৃষ্ট শস্য উৎপন্ন হইতে পারে, সময়োপযোগী কাল ভিন্ন অনুর্ব্বর ভূমিতে কীটদষ্ট বা অপুষ্ট বীজ বপন করিয়া সেরূপ

শস্ত লাভ যেরূপ সম্ভবপর নহে, পরিণত বয়সে স্বাস্থ্যবতী রমণীর সহিত সরল, সুস্থ ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষের মিলনের অভাবেও স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘায়ু সন্তান লাভের আশাও সেইরূপ সম্ভব নহে। আগেকার বাঙ্গালী এ সকল কথা বুঝিত, সেই জন্য একদিন বাঙ্গালা দেশে বীর, শূর ও বলিষ্ঠ যুবকের অভাব ছিল না। আর যেদিন বাঙ্গালী সে কথা ভুলিয়া গিয়াছে, সেই দিন হইতেই বাঙ্গালায় অজীর্ণ ও ধাতু দৌর্ব্বল্যগ্রস্ত যুবকগণ শীর্ণ দেহ, দীর্ণ হৃদয় ও কোটরাগত চক্ষু লইয়া বাঙ্গালা দেশে স্বাস্থ্যদৈন্যের জলন্ত স্বাক্ষ্য প্রকাশ করিতেছে। বাঙ্গালী মরিতেছে অনেক কারণে, কিন্তু বাঙ্গালা দেশে ভূমিষ্টের পরই যে প্রতি মিনিটে চারিটি করিয়া শিশু কালকবলিত হয়, তাহার সর্ব্ব প্রধান কারণ যে অবৈধ স্ত্রী-পুরুষের অসঙ্গত মিলনের ফলসম্ভূত—তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যদি আজ বাঙ্গালা দেশ হইতে ঘৃণিত—জঘন্য—বর্ব্বরোচিত পণ প্রথা উঠিয়া যায়,—যদি আবার সে কালের মত বয়ঃবিচারের পার্থক্য বজায় রাখিয়া—কোষ্ঠী বিচারে—গণ-রাশি মিলাইয়া স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ব্যবস্থা করা হয়—যদি আবার পর্ব্বদিন বাছিয়া, তিথি নক্ষত্র দেখিয়া শুধু "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা:"—এই ঋষিবাক্য স্মরণ রাখিয়া সুসন্তান লাভের ব্যবস্থা করা হয়—তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশে আবার যে সে কালের মত আশী নব্বই পঁচানব্বই একশত বৎসরের পরমায়ু লইয়া কর্ম্মঠ, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ু ব্যক্তিগণ ফিরিয়া আসিতে পারেন, তাহা সুনিশ্চয়। কিন্তু সে কথা শুনিবেই বা কে? বুঝিবেই বা কে! কাজেই বাঙ্গালী যে ক্রমশঃই ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বাঙ্গালী মরিতেছে আরও অনেক কারণে। সেই কথা গুলি এইবার বলিব। গবর্ণমেণ্ট শিশু মৃত্যুর কারণ নির্দ্দেশে দেখাইতেছেন, সুতিকা গৃহের জঘন্য প্রথা বাঙ্গালীর শিশুমৃত্যু-বাহুল্যের একটা বিশেষ কারণ। এ কথা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু সুতিকা গৃহের এই অসভ্য প্রথা যে বাঙ্গালা দেশে আগেও ছিল না এমন নহে, কিন্তু সেই অসভ্য প্রথার মধ্যেই প্রসূতি ও সদ্যজাত শিশু শরীরে যে স্বেদ-তাপ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, তাহা এখন অনেক স্থলেই উঠিয়া গিয়াছে। সদ্যজাত সন্তানকে সর্ব্বাঙ্গে সর্ষপ তৈলে অভ্যঙ্গ করিয়া মার্ত্তণ্ড কিরণে যে ফেলিয়া রাখার প্রথা ছিল, তাহাও এখন বিলুপ্ত। প্রসবের পর বাঙ্গালী মহিলাকে যে 'পোয়াতি পাচন খাওয়াইবার রীতি ছিল, তাহাও এখন লুপ্ত হইয়াছে। আমরা সে কালের অসভ্য প্রথা—সুতিকা গৃহের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করি নাই, কিন্তু সেই অসভ্য যুগের অন্যান্য প্রথাগুলির যে কতক কতক পরিবর্ত্তন করিয়াছি ইহাও বাঙ্গালীর শিশুমৃত্যু-বাহুল্যের পথ বিস্তৃত করিয়া তুলিতেছে। দেশে দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য,—অন্যান্য কোনো খাদ্যের প্রয়োজন নাই—অমৃত তুল্য দুগ্ধ পানে যে বাঙ্গালী শিশুর দেহ পুষ্ট হইবে, মনোবৃত্তি-স্ফূরণের সহায়তা করিবে—তাহাকে যে ভবিষ্যৎ জীবনে নীরোগ, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ করিয়া তুলিবে, সে দুগ্ধ শিশুদিগকে আমরা উপযুক্ত ভাবে খাওয়াইতে পারিনা। আমাদের এই দুর্ভাগ্যই আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের আয়ুক্ষয়ের কারণ করিতেছে।

এ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিবার আছে; আমরা ক্রমশঃ সব কথা বলিব।

বিধি নিষেধে আয়ুর্ব্বেদ।

(শ্রীরাম সহায় কাব্যতীর্থ বেদান্ত শাস্ত্রী।)

—— :০: ——

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে উষা বড় মনোরম। উষাগমনের পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ বিহিত। উষায় ভ্রমণ, প্রভাতীবায়ুসেবন, পুষ্পোদ্যানে যাইয়া পুষ্পচয়ন, নদীতীরে বেদমন্ত্রে সান্ধ্যাহ্নিক সম্পাদন শাস্ত্রের ব্যবস্থা। (স্ত্রীশূদ্রের পক্ষে তান্ত্রিক সন্ধ্যা)।

প্রাতঃসূর্য্য দর্শন সর্ব্ববিধ কালুষ্যের নাশক। সূর্য্যকরস্পর্শে রোগের বীজাণু নাশ পায়, সূর্য্যপানে দৃষ্টিদ্বারা চক্ষুরোগের উপকার হয়। সূর্য্যপানে দৃষ্টিপূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ চক্ষুর হিতকর।

প্রস্রাবান্তে জলশৌচ না করিলে পাপশ্রুতি আছে। প্রস্রাবশেষ বস্ত্রে লাগে, বহুক্ষণ প্রস্রাবশেষ থাকিলে মেহাদি হইবার সম্ভাবনা জন্মে। জলে প্রস্রাব বিশেষ পাপজনক "আপো বৈ নারায়ণঃ"—জলের বিশুদ্ধি রক্ষা হিতকর। (মলত্যাগ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে বলিয়া করিলাম না) দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবনই সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী। তদ্বারা দন্তমূল সুদৃঢ় হয়, সত্বর পড়িবার আশঙ্কা তেমন থাকে না। অন্যূন দ্বাদশবার কুলকুচা করার নিয়ম। তাহাতে মুখের লালা দূর হইয়া দুর্গন্ধ দূরে যায়, খাদ্যবিশেষ যাহা দন্তে লাগিয়া থাকে, তাহা বাহির হইয়া যায়। ক্ষুধাশক্তি—পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাক।

উষাস্নানে তৈলম্রক্ষণ নিষিদ্ধ। ঐরূপ সময়ে তৈল ম্রক্ষণে শৈত্যের আধিক্য জন্মে। সূর্য্যোদয়ের পর অবশ্য এ ব্যবস্থা নহে। সপ্তছিদ্রে ও পদতলে তৈলদান বিহিত। ইহা দীর্ঘ জীবন লাভের উপায়।

সান্ধ্যাহ্নিক কৌষেয় বসনে করাই সুব্যবস্থা

পূজা বা জপকালে চিন্তা বা ধ্যানের ফলে ভিতরে একটি শান্ত কোমল তড়িতের সঞ্চার হয়। সেই সময়ে যদি বাহিরের অশান্ত তড়িতের সহিত সংঘর্ষ ঘটে, তবে একাগ্রতা জন্মিবে না, মনশ্চাঞ্চল্য দেখা দিবে। কৌষেয় বস্ত্রই অশান্ত তড়িতের প্রবেশের প্রতিরোধক। সত্ত্ববৃদ্ধির জনক, পবিত্রতা বর্দ্ধক, কিন্তু কৌষেয় বসনে ভোজন নিষিদ্ধ। আসনার্থ কাষ্ঠাসন অপ্রশস্ত। কুশাসন, পশমী আসন, মৃগ চর্ম্মাসন প্রশস্ত। কুশাসনাদিও বাহিরের তড়িৎ প্রবেশের প্রতিরোধক। ধরার পারিপার্শ্বিক পদার্থগুলি তড়িত প্রবেশের সহায়ক বলিয়া তাহার প্রতিরোধোপায় অবলম্বনীয়। "স্থির সুখ মাসনং"।

চন্দনগন্ধ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বড়ই মনোমদ ও উপকারক। ললাটেও নাসিকাগ্রভাগে চন্দনলেপনে চক্ষু শীতল থাকে, চক্ষুরোগের আশঙ্কা কম হয়, দৃষ্টিশক্তি বাড়ে। সন্ধিস্থলে লেপনে বাতরোগাক্রমণের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। এ গন্ধ পবিত্র, প্রফুল্লতা বর্দ্ধক সর্ব্ববিষ দূষিত বস্তু সম্পর্ক ভয়শূন্য।

তুলসী বিষ্ণুপ্রিয়া। তুলসীবায়ু ম্যালেরিয়াদি রোগ শক্তির বিনাশক। তুলসী

শিশুদের রক্ষাকর্ত্রী জননী। সর্দ্দিকাশীর পরম রসায়ন। সমস্ত দূষিত বাতাস তুলসী বায়ুস্পর্শে নির্ম্মল হইয়া থাকে, প্লেগ-কলেরা প্রভৃতি রোগের জীবাণু নাশ পায়। ইহার পচন্নিবারিকা শক্তি "কারবলিক" অপেক্ষা অধিক বলিয়া এক্ষণে প্রমাণিত হইয়াছে। নিমপাতার সঙ্গে তুলসীপাতা বাটিয়া আধুনিক ডাক্তারেরা পুলটিস্ দিয়া বিশেষ সুফল পাইতেছেন। তুলসীপত্র ভক্ষণ স্বাস্থ্যের উপকারী।

একমাত্র বিল্বপত্রের ভোজনে উৎকট রোগ হইতে অব্যাহতি লাভ হয়। বনগ্রামের শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় [বনগ্রাম ষ্টেসনের উপরই বাড়ী] ইহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। বিল্বপত্রের রস সেবনে ৩।৪ দিন উপবাস করা যায়। উহার রসের অনেক শক্তি।

রন্ধন মৌনী হইয়া করাই ব্যবস্থা। এখনও দুর্গোৎসবের ভোগ রন্ধন—মুখে বস্ত্র দিয়া কোন কোন স্থানে হইয়া থাকে। অন্ন যত অল্প লোকের হস্তে খাওয়া যায়, ততই ভাল। স্বপাক এবং মাতা, স্ত্রী, ভগ্নী প্রভৃতির হস্তে খাওয়াই বিধি। রন্ধন নানা ব্যক্তির খাইলে রুচি একরূপ থাকে না, পরিপাকের একটি স্থিরতা থাকে না। নানাজাতীয় নানা ব্যক্তির প্রস্তুত অন্নাদি ভোজনে ভিন্ন ভিন্ন তড়িৎ দেহে প্রবেশ করে, ফলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। রন্ধনে মানসিক প্রবৃত্তির ছায়াপাত ঘটে। পাপীর পাপ-অন্নের ভোজনে পাপ-প্রবৃত্তির সংক্রমণের আশঙ্কা আছে। হোটেলের অন্ন ভোজন বাজারের লুচি, সিঙ্গাড়া, কচুড়ি ভক্ষণ নিষিদ্ধ। তাহাতে ভেজালঘৃত প্রভৃতির ভয় তো আছেই, তা' ছাড়া কারিকরেরা প্রায়ই বেশ্যাগৃহে রাত্রি কাটাইয়া সেই বস্ত্রে স্নান না করিয়াই ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। রাস্তার ধুলি যাহা সকল রোগের নিদান—তাহা ঐ সকল দ্রব্যে পড়িয়া থাকে, মাছি প্রভৃতির উপদ্রব ঘটিয়া থাকে, এবং ঐ সকল দ্রব্য ক্রয়কালে ক্রেতা মাত্রকেই স্পর্শ করা হইতেছে। দ্রুত বা বা বিলম্বে ভোজন নিষিদ্ধ। দ্রুত ভোজনে পরিপাক তেমন হয় না, চর্ব্বণ ঠিক মত ঘটে না, বুকে বাধিবার ভয় থাকে। অধিক বিলম্বেও অন্নাদি শীতল হইয়া যায়, অত্যধিক আহার ঘটে। ভোজন সময়ে মৌনী হওয়া অধিক আবশ্যক। একমনে মৌনী হইয়া ভোজন স্বাস্থ্যের অনুকূল। কথা কহিতে কহিতে ভোজনে মনঃসংযোগের অভাব জন্মে, নিষ্ঠীবন পড়িয়া অন্ন দূষিত হইবার শঙ্কা থাকে, একই মুখে দুইটি কার্য্য যুগপৎ করা অনিষ্টকর।

ভারতবর্ষে সাত্ত্বিক আহারই ব্যবস্থিত। যাহাতে আয়ুসত্ত্ববলা রোগসুখ প্রীতিবিবর্দ্ধন হয় সেই আহারই বিধি। পূতি, পর্য্যুষিত, (বাসি) কীটাদি দূষিত সামগ্রীর আহার— তামসিক আহার। আহার সম্বন্ধে আলোচনা অনেক হইয়া গিয়াছে, এজন্য আর বিস্তারিত করা গেল না।

ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে আচমন বিহিত। আচমন অন্নের আচ্ছাদন। একটি উপস্তরণ নিম্নের আচ্ছাদন, অপরটি পিধান উপরের আচ্ছাদন। জল দ্বারাই আচমনের ব্যবস্থা। ভোজনের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ জলপান, শেষে কিঞ্চিৎ জলপান করিতেই হইবে, তা' ছাড়া আহার করিতে করিতে জল পান—সে

আবশ্যক ও ইচ্ছাধীন মাত্র। ক্ষুধার প্রকোপে, পরিশ্রমে ও তাপে কণ্ঠনালী শুষ্ক ও বিরস হইয়া যায়, কিঞ্চিৎ আচমন জল দ্বারা সেই শুষ্কতা ও বিরসতা দূর করিয়া কণ্ঠনলিকে আর্দ্র, পরিষ্কৃত ও সরস করিয়া লইতে হয়, অল্পে অল্পে কণ্ঠ ভিজানই উপকারক। পাঁচটি বায়ু প্রাণ, আপন, ব্যান, উদান, সমান আমাদের দেহে বিদ্যমান। সেই বায়ুরও বিশুদ্ধি সম্পাদন করা হয়। আচমন দ্বারা কণ্ঠের আর্দ্রতা দূর না করিয়া ভোজনে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। ভোজনান্নের অগ্রভাগ ও শেষভাগ দুইই পরিত্যাজ্য।

ভোজনান্তে তাম্বুলচর্ব্বণ গৃহস্থের পক্ষে বিহিত। তাম্বুলচর্ব্বণে মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়, পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি পায়, দেহের মধ্যে অল্প তড়িৎ ক্রিয়ার অনুভূতি জন্মে, মুখেরও শ্রী খুলে। পানই বড় রকমের মুখশুদ্ধি। পানে শরীরের কিঞ্চিৎ রস বৃদ্ধি করে, ভোগ কামনায় কিঞ্চিৎ সহায় হয়, আবেশের আমেজ আনিয়া দেয়—ইত্যাদি কারণে যতি ও বিধবার পক্ষে তাম্বুল সেবন নিষিদ্ধ।

কেবল সুপারি খাওয়া ঠিক নহে। ইহাতে সহজে অন্ন জীর্ণ হয় না। মাথাঘোরা, বদহজম প্রভৃতি রোগ জন্মিবার ভয় থাকে। অধিক সুপারি ভোজীর অপকার অত্যন্ত অধিক।

কথায় কথায় আমাদের শাস্ত্রে হস্তপদ প্রক্ষালন ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। হস্তপদ যত অধিকবার ধৌত করা যায় ততই ভাল, ইহা আজকাল শীতপ্রধান দেশের চিকিৎসকেরা পর্য্যন্ত বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। হস্তপদ ধৌত করিয়া পরিষ্কৃত বস্ত্রে মুছিয়া লইয়া তবে উপবেশন ও পান ভোজনাদি নির্ব্বাহ করিবেন। জুতা পরা আছে, তথাপিও পদ ধৌত করা আবশ্যক।

"আদ্রপাদস্তুভুঞ্জীত নাদ্রপাদস্তু শায়িত" আদ্রপদ হইয়া ভোজন করিবেন; আদ্রপাদ হইয়া শয়ন করিবেন না। আদ্রপদে শয়নে শৈত্যের সঞ্চার হইতে পারে, মস্তিষ্কে জলসঞ্চার হইতে পারে ইত্যাদি। শয্যা অধিক কঠিন ভাল নহে, অধিক কোমলও ভাল নহে। অধিক কঠিন হইলে কষ্ট, উহার ফল গাত্রবেদনা। অধিক কোমল হইলে আরাম বটে কিন্তু বহুদিন অভ্যাসের ফলে শরীরের দৃঢ়তা থাকিবে না, শ্রমে সহজেই কাতরতা জন্মিবে, কষ্টে সহিষ্ণুতা দেখা যাইবে না। ভোগীর ভোগবিলাসের ইহা বিশিষ্ট উপকরণ, কিন্তু নিদ্রার পক্ষে উপযোগী নহে।

উত্তর শিয়রে ও পশ্চিম শিয়রে শয়ন নিষিদ্ধ। প্রবাসে অগত্যা পশ্চিম শিয়রে শোওয়ার ব্যবস্থা একস্থলে দেখা যায় মাত্র। পশ্চিম শিয়রে ও উত্তর শিয়রে শয়ন দুইই দোষাবহ। ধরার উপর দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বশিয়রে শায়িত ব্যক্তির নিকট উহা অধোগামী প্রবাহের কার্য্য করে, পশ্চিম শিয়রে শায়িত ব্যক্তির পক্ষে উহা ঊর্দ্ধগামী প্রবাহের কার্য্য করে। কাজেই পশ্চিম শিয়রে শয়নে মস্তিষ্ক এবং অন্যান্য শারীরযন্ত্রে রক্তাদি সংগৃহীত হইতে পারে; ফলে প্রদাহ জন্মিতে পারে, মস্তিষ্ককে বা অন্যান্য শারীর যন্ত্রকে প্রদাহিত করা বা পীড়িত করিয়া তোলা কাহারও উচিত নহে।

উত্তর শিয়রে শয়ন করিলে উক্ত তড়িৎ

প্রবাহ সম্মুখে আসিয়াই লাগে—কাজেই উত্তর শিয়রে শয়নও পশ্চিম শিয়রে শয়নের মত অনিষ্টকর। বামদিকে শয়নই যখন বিধি, তখন উত্তরশিয়রে শয়নে তড়িৎ প্রবাহ সম্মুখেই আসিয়া লাগিবে। দক্ষিণ শিয়রে শয়নে তড়িৎপ্রবাহ পৃষ্ঠদেশে আসিয়া স্পর্শ করিলে কোন ক্ষতি নাই। পূর্ব্ব শিয়রে শয়নই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

দেখিলাম, শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধগুলিই আয়ুর্ব্বেদের স্বাস্থ্যরক্ষার কার্য্য করিয়া থাকে। যাহা স্বাস্থ্যকর নহে তাহাই আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে পাপজনকরূপে কথিত। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের শাস্ত্রশাসনে শাসিত ব্যক্তিগণকে ধর্ম্মভয় না দেখাইলে ত তাহারা শুনিবে না। তাই শাস্ত্রে পাপের ভয় দেখাইয়া আয়ুর্ব্বেদের কার্য্যই প্রকারান্তরে সাধিত করা হইতেছে।

সংহিতাও বিষ্ণুপুরাণাদি হইতে কয়েকটি বিধিনিষেধ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। দেখিবেন, কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও শাস্ত্রকারগণ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। স্বাস্থ্যরক্ষার সম্বন্ধে এগুলি মূল্যবান্।

কেশ সর্ব্বদা চিক্কণ ও পরিষ্কার করিবে। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, নাসিকা কুঞ্চন, মুখ আবৃত না করিয়া জৃম্ভণত্যাগ (হাইতোলা), মুখ ঢাকিয়া শ্বাস বা কাশ ত্যাগ কখন করিবে না। নখবাদ্য, নখদ্বারা তৃণচ্ছেদ, ভূমিলেখন অবিহিত জানিবে। উচ্চহাসি, হাসিতে হাসিতে, উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতে কহিতে অধোবায়ু নিঃসরণ (বাতকর্ম্মত্যাগ) করা উচিত নহে।

স্রোতঃস্বিনীর স্রোতোরহিত জলে স্নান অবিধি, কর্ণ নাসিকা মুখ আচ্ছাদন করিয়া চক্ষু বুজিয়া ডুব দেওয়াই বিধি। নতুবা অনেক অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

শ্মশ্রু চর্ব্বণ করা উচিত নহে। ছিন্নকেশ, অস্থি, কণ্টক বহ্নি ভস্ম তুষ, স্নানার্থ জল পদদ্বারা মাড়াইয়া যাওয়ারও নিষেধ আছে। শ্লেষ্মা-মলমূত্র- রক্ত উল্লঙ্ঘন করাও ভাল নহে। আহার কালে শ্লেষ্মা ত্যাগ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবেন না, হাঁচিবে না, উচ্চ হাসি হাসিবেন না।

স্নানান্তে হস্তপদ দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করা অবিহিত, কেশ কম্পন অকর্ত্তব্য। পদ দ্বারা আজ্ঞয়ন নিষিদ্ধ। নখ ডুবান জল খাওয়া অনুচিত। তৈল- ঘৃত-ব্যঞ্জনাদি হস্ত স্পৃষ্ট করিয়া দিবেনা।

নিদ্রাভঙ্গের পর অধিক সময় দাঁড়াইয়া থাকা, দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করা, বর্ষা ও রৌদ্রে ছত্র ব্যবহার না করিয়া ও পাদুকা ব্যবহার না করিয়াই পথ চলা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। পার্শ্ব বা দূরবর্ত্তী স্থান দেখিতে দেখিতে যাইবেন না; সম্মুখের চারিহাতের পানে লক্ষ্য করিয়া গমন করিবেন।

শুষ্ক কুলটোপা খাওয়া নিষিদ্ধ। দধি, মধু, অম্ল, ঘৃত, শক্তু, ছাতু, পায়স বা পরমান্নের অবশিষ্ট রাখা নিষেধ, ব্রক্ষণাবশিষ্ট তৈল মাখা, পর ব্যবহৃত বস্ত্রাদি পরিধান অনিষ্টকর।

সূর্য্যোদয় কালে বা সূর্য্যাস্তকালে পীড়িত ব্যক্তি ব্যতীত কাহারও শয়ন করিয়া থাকা উচিত নহে। ছিদ্রযুক্ত শয্যায় শয়ন বিহিত নহে। মলিন ও অনাবৃত শয্যায় শয়ন অপ্রশস্ত।

প্রতিকূলা, কুপিতা, গর্ভিণী, পীড়িতা, রজস্বলা, অন্যকামা, ক্ষুধার্ত্তা ও অতি ভোজ-

নার্ত্তা স্ত্রীকে সম্ভোগ করা বিশেষভাবে অকর্ত্তব্য। স্নাতা, সজ্জিতা, গন্ধমাল্যদ্রব্যভূষিতা ও সকামা স্ত্রীতেই সম্ভোগই বিহিত। প্রাঙ্গনে, জলমধ্যে, উপবনে, মলমূত্র রোধাবস্থায়, ভূমিতলে, দিবাভাগে, রাক্ষসী বেলায় এবং শেষ রাত্রে সম্ভোগ নিষিদ্ধ। হস্তমৈথুনাদিতে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা, রজঃস্বলা সম্বন্ধেও তাই; স্বপ্নদোষেও তাই।

সংক্রামক রোগ ও জীবানুতত্ত্ব।

(কবিরাজ শ্রীরাখাল দাস সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ, বিদ্যাবিনোদ)
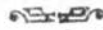
যে সকল রোগ একদেহ হইতে অন্যদেহে সংক্রমিত হয়, সেই সকল রোগকেই সংক্রামক রোগ বলা হইয়া থাকে।

ঋতুবিপর্য্যয়ে জল, বায়ু, দেশ ও কাল প্রভৃতি বিকৃত হইলে, যে সকল রোগ সংক্রামকরূপে জনপদসমূহ ধ্বংস করিতে প্রস্তুত হয়, তাহাদিগকে কেবল সংক্রামক বলা হয় না,—তাহারা জনপদোদ্ধংসী নামে অভিহিত হয়। মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন,—

"কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ।
ঔপসর্গিক রোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম্॥"

অর্থাৎ কুষ্ঠ, জ্বর, যক্ষ্মা, চোকউঠা এবং পাপজ ও ঔপসর্গিক রোগ সকল এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়া থাকে। কি প্রকারে ঐ সকল রোগের সংক্রমণক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে,—তৎসম্বন্ধে তিনি হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন,—

"প্রসঙ্গাৎ গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
একশয্যাসনাচ্চৈব মাল্যগন্ধানুলেপনাৎ॥"

অর্থাৎ,—সহবাস, গাত্রসংস্পর্শ, নিঃশ্বাস একত্র ভোজন, এক শয্যায় শয়ন, রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্র, মাল্য ও অনুলেপন ব্যবহার;—এই সকল কারণে সংক্রামক রোগ সকল একদেহ হইতে অন্যদেহে সংক্রমিত হইয়া থাকে।

অধুনা পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন,—মহর্ষি সুশ্রুত কথিত "জ্বর, কুষ্ঠ, শোষ, নেত্রাভিষ্যন্দ এবং ঔপসর্গিক রোগ সকল ছাড়াও আরও কতকগুলি রোগ আছে, যাহারা একদেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রমিত হইতে পারে। যেমন,—টাইফয়েড ফিবার হাম, বসন্ত, পাচড়া, ইরিসিপ্লাস, কলেরা, প্লেগ, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ডিপ্থিরিয়া গর্ম্মি, গণোরিয়া ও মামপ্স্ ইত্যাদি।

শ্রেণীবিভাগ ও বর্ণনার তারতম্য অনুসারে পূর্ব্বোল্লিখিত রোগগুলি পাশ্চাত চিকিৎসকগণের মতে সুশ্রুতোক্ত রোগসমূহ হইতে আপাততঃ পৃথক্ বলিয়া প্রতীত

হইলেও উহারা প্রকৃতপক্ষে পৃথক্ নহে। তাঁহাদের 'টাইফয়েড্ফিভার' আমাদের সান্নিপাতিক জ্বরাতিসার, 'মাম্পস্'—জ্বরাদৌ কর্ণমূলে শোথসংযুক্তসান্নিপাতিক জ্বরবিশেষ, কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর, অস্বাভাবিক ঋতুপ্রভাবে বিকৃত জল, বায়ু ও দেশ জন্য জনপদোদ্ধংসী রোগসমূহের অন্যতম কালান্তর-প্রাণহর যকৃৎ ও প্লীহাসংযুক্ত বিষমজ্বরবিশেষ। প্লেগ সদ্যঃপ্রাণহর জনপদোদ্ধংসী যুগপৎ সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন সান্নিপাতিক বিকারবিশেষ। পাচড়া ও দদ্রু কুষ্ঠপর্য্যায়ভুক্ত। বিসর্প, ডিপ্থিরিয়া, কলেরা, হাম, বসন্ত, গর্ম্মি ও গণোরিয়া পাপরোগের অন্তর্গত। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসকগণের অনভিজ্ঞতা বলিয়া পাশ্চাত্যচিকিৎসকগণের অনুযোগ করিবার বোধ হয় যথেষ্ট কারণ দেখা যায় না। তদ্ভিন্ন সংক্রামকরোগ সকলের সংক্রমণের উপায় সম্বন্ধে, বোধহয় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিকিৎসকগণের পরস্পর কোনপ্রকার মতভেদ নাই।

সংক্রামকরোগ সকলের সংক্রমণের উপায়-সকল পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, ঐ সকল রোগের এমন একটা কিছু শক্তি বা পদার্থ আছে, যাহা নিঃশ্বাস প্রভৃতি দ্বারা একদেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রমিত হইয়া সুস্থশরীরকে বিকৃত করিয়া তুলে। জ্বর, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা ও বসন্ত প্রভৃতি রোগহেতুর এমন কোনপ্রকার প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান মূর্ত্তি তো কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহারা রোগীর নিঃশ্বাস প্রভৃতির দ্বারা সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া থাকে। এজন্য স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, হেতুর প্রত্যক্ষ দৃশ্য কোন প্রকার মূর্ত্তি না থাকিলেও উহাদের এমন একটা অমূর্ত্ত রূপ আছে, যাহারা রোগীর দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রমিত হইতে পারে।

প্রাচীনকালে মহর্ষিগণ তপঃপ্রভাবে সংসারের যাবতীয় পদার্থের নিগূঢ়তত্ত্বসমূহ দিব্যচক্ষুঃ দ্বারা অবলোকন করিতেন। তাঁহারা সংক্রামক রোগহেতুর অমূর্ত্ত বীজসকল প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সকল সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রোগজীবাণু বা কৃমিবীজ সাধারণ লোকলোচনের বিষয়ীভূত নহে। এজন্য তাঁহারা বলিয়াছেন,—"সৌক্ষ্মাৎ কেচিৎ অদর্শনাঃ।" অধুনা পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদেরা সেই সকল সূক্ষ্মকৃমি বা জীবাণুর মধ্যে কতকগুলি অণুবীক্ষণযন্ত্র সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছেন। গর্ম্মিরোগের সূক্ষ্ম কৃমি দশ বৎসর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃত ছিল। বসন্ত, হাম প্রভৃতি কয়েকটী সংক্রামক রোগের জীবাণুতত্ত্ব আজও সম্যক্ স্থিরীকৃত হয় নাই।

বর্ত্তমান সময়ে কৃমিশব্দ যেরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থে পর্য্যবসিত হইয়াছে অর্থাৎ এখন কৃমি বলিলে কেবলমাত্র পুরীষজ প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান এক প্রকার স্থূল জীবমাত্রকেই বুঝায়। প্রাচীন কালে সেরূপ বুঝাইত না। তখন কৃমি বলিলে মানবশরীরে সম্ভূত রোগজীবাণু মাত্রকেই বুঝাইত। ঐ সকল কৃমির উৎপত্তিক্ষেত্র,—পুরীষ, শ্লেষ্মা, শোণিত এবং মল অর্থাৎ শরীরের যাবতীয় ক্লেদ।

সংক্রামক রোগ সকলের যে এক প্রকার অণুপরিমিত কৃমিবীজ আছে, তাহারা জীবন্ত অণুপ্রমাণ জীব বলিয়া আমাদের প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষায় ঐ সকলকে জীবাণু বলিতেও পারা যায়। ঐ সকল জীবাণু বা সূক্ষ্ম কৃমি কীট

সমূহ রোগীর সর্ব্বশরীর ব্যাপ্ত করিয়া প্রভূত পরিমাণে বাস করে ও বায়ুপ্রবাহে অহরহঃ ভাসিয়া বেড়ায়। সেজন্ত রোগীর ব্যবহৃত দ্রব্যাদিতে ঐ সকল জীবাণু মিলিত হইয়া থাকে এবং পূর্ব্বোক্ত উপায় সকলের দ্বারা দেহান্তরে সংক্রমিত হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বলেন,—সংক্রামক রোগের জীবাণুই তাদৃশ রোগোৎপত্তির এক মাত্র কারণ বা নিদান। অতএব সংক্রামক রোগীর সম্পর্ক হইতে দূরে থাকিতে পারিলে, আর তাদৃশ রোগাক্রমণের কোন প্রকার আশঙ্কা থাকিতে পারে না। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ এ মতের সমর্থন করেন না। প্রসঙ্গ বা নিঃশ্বাস প্রভৃতি দ্বারা রোগ সংক্রমণের উপায় নিরুদ্ধ হইয়া থাকে, ইহা অবশ্য সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া সংক্রামক রোগে রুগ্ন ব্যক্তির সম্পর্ক ত্যাগ করিলেই যে তাদৃশ রোগের উৎপত্তি রহিত হইবে এবং নিকটে থাকিলেই যে, রোগ তাহাকে অবশ্যই জড়াইয়া ধরিবে, একথা আয়ুর্ব্বেদ কখনই বলে না। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়,—যে পল্লীতে বা গ্রামে পূর্ব্বে একজনেরও কোনপ্রকার সংক্রামক রোগ হয় নাই অথবা কেহ স্থানান্তর হইতে তাদৃশ রোগের জীবাণু সকল বহন করিয়া আনে নাই, সেই সকল স্থানেও হঠাৎ একজনের দেহে সর্ব্বপ্রথম সংক্রামক রোগ দেখা দিয়াছে। এবং এমনও দেখিতে পাওয়া যায় যে,—সংক্রামক রোগগ্রস্ত সন্তানের জননী রুগ্ন-সন্তানকে দিবারাত্র অঙ্কাশ্রিত করিয়া অথবা পরিচর্য্যাদি করিয়াও সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হন নাই। এই জন্যই আয়ুর্ব্বেদ বলেন,—জীবাণু সংক্রমণ ঐ সকল ব্যাধির নিদান নহে, বাহন মাত্র। যদি জীবাণু সংক্রমণই একমাত্র সংক্রামক ব্যাধির উৎপত্তির কারণ হইত, তাহা হইলে অনাক্রান্ত প্রদেশে সংক্রামক ব্যাধির প্রথমোৎপত্তি কখনই সম্ভবপর হইত না এবং সংক্রামক রোগের পরিচারকগণেরও নিশ্চয় তাদৃশ রোগের উৎপত্তি হইত।

আয়ুর্ব্বেদের মতে, প্রসঙ্গ নিঃশ্বাস ও সহবাস প্রভৃতি সংক্রামক রোগোৎপত্তির নিদান নহে, সংক্রমণের উপায়মাত্র। নিদান অন্য প্রকার। যদি রোগীর নিঃশ্বাস প্রভৃতি দ্বারা আগত জীবাণুই জ্বর, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা ও বসন্ত প্রভৃতি রোগের উৎপত্তির একমাত্র প্রকৃষ্টনিদান হইত, তাহা হইলে, তাঁহারা পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মত জীবাণু হইতেই জীবাণুর উৎপত্তি না লিখিয়া কৃমি নিদানে,—

"অজীর্ণাধ্যশনাসাত্ম্যবিরুদ্ধমলিনাশনৈঃ।"

ইত্যাদি নিদান লিখিতেন না। এবং বসন্ত রোগেরও "কট্বম্ললবণক্ষারবিরুদ্ধাধ্যশনাশনৈঃ। ইত্যাদি নিদান নির্দ্দেশ করিতেন না। যদি জীবাণু হইতেই সংক্রামক রোগের উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত নিদান বচন সকলের আর কোনপ্রকার সার্থক্য থাকিত না এবং ঐ সকল বচন অমূলক কল্পনা মাত্র বলিয়া বোধ হইত।

এ কথাও কেহ বলিতে পারেন না যে, জীবাণু সম্বন্ধে তাঁহাদের কিছু অভিজ্ঞতা ছিল না, তাই তাঁহারা সংক্রামকরোগের অনুরূপ নিদান নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যে জীবাণু সম্বন্ধে কতদূর বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তাহা চরক ও সুশ্রুতের ক্রিমিনিদান দেখিলেই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, সংক্রামক রোগের জীবাণু সকলের সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টি কবে কি কি প্রকারে হইল। উহারা কি পরম কারুণিক জগদীশ্বর কর্ত্তৃক লোকসৃষ্টির সহিত সৃষ্ট হইয়া অনাদি কাল হইতে লোকসংহার কার্য্যে প্রবৃত্ত আছে অথবা কোন অবরকালে উদ্ভূত হইয়া পাপাচারী মানবগণের দুঃখময় প্রায়শ্চিত্তের সূত্রপাত করিয়াছে। সম্বন্ধে এ পাশ্চাত্যবিজ্ঞান বলেন,—জীবাণু হইতেই জীবাণুর উৎপত্তি। যেমন বীজ হইতে বৃক্ষ, পরে পুনরায় তাহা হইতে বীজ জন্মে। তাঁহাদের মতে বীজ অনাদি অথবা উহাদের আদিম বীজ ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট, সেই অনাদি প্রবাহগত বীজপরম্পরা এখনও চলিয়া আসিতেছে এবং প্রলয়ের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিবে। জগতে নির্বীজ সৃষ্টি একান্ত অসম্ভব। গ্রীষ্মে জলাশয়ের জল শুষ্ক হইয়া গেলে তাহাতে যে উদ্ভিজ্জ জন্মে অথবা নিদাঘসন্তপ্ত শুষ্কজলাশয়ে মৎস্য জন্মে—ইত্যাদি দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ঐ সকল স্থানে নির্জীব সৃষ্টি হইয়াছে। নিশ্চয়ই পূর্ব্বোক্ত স্থান সকলে ঐ সকল পদার্থের কোন প্রকার বীজসম্পর্ক ছিল, অথবা বায়ুপ্রবাহদ্বারা কিংবা অন্য কোন প্রকার অলক্ষিত উপায়ে পূর্ব্বোক্ত পদার্থনিচয়ের বীজসমাগম ঘটিয়াছিল এবং সেই সকল বীজ হইতেই ঐ সকল পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। যদি বায়ুদ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে ঐ সকল স্থানে বীজসমাগম না হইত, তাহা হইলে কোন প্রকার সৃষ্টিও সম্ভবপর হইত না। অণুপরিমিত জীবাণু, অপ্রত্যক্ষ ভাবে সর্ব্বদাই বায়ুস্রোতে ভাসিয়া বেড়ায়, সাধারণ লোকের দৃষ্টিগোচর হয় না বলিয়া লোকে উহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে, ঐ সকল জীবাণুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায়। কাজে কাজেই অনুমিত হয় যে, জগতে নির্বীজ সৃষ্টি নাই। সুতরাং সংক্রামক রোগসকলের জীবাণুনিচয়ও মানবসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্ট হইয়া অনাদি কালস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে।

রোগের নিদান সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতে অনেক সময়ে সম্পূর্ণ বিরোধ দেখিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-প্রণালীকে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া দোষ দিতে পারা যায় না। যেহেতু পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ প্রত্যক্ষবাদী ও স্থূলদর্শী। তাঁহারা প্রত্যক্ষ ভিন্ন কোন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকারে কুণ্ঠিত। তাঁহাদের মতে সৃষ্টির পূর্ব্বে কোনও পদার্থ ছিল না এবং ইহকালের অবসান হইলেই সব জ্বালা মিটিয়া যাইবে। সুতরাং তাঁহারা সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি লইয়া ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের অভ্যন্তরে অনন্তকালপ্রবাহাগত জীবশ্রেণীর অন্তর্নিহিত তত্ত্বসমূহের রহস্যোদ্ঘাটনে কথনও সমর্থ হইবেন কিনা সন্দেহ। তাঁহাদের সহিত তপঃপ্রভাসমুদ্ভাসিতজ্ঞানসম্পন্ন ত্রিকালদর্শী আর্য্যমহর্ষিগণের গভীর তত্ত্বজ্ঞানের তুলনা কথনই সম্ভবপর নহে। সুতরাং উভয়বিধ মতের বিরোধভঞ্জন করিতে যাওয়া বাতুলতা-মাত্র। পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণের মতে সংক্রামক রোগসকলের আদিনিদান জীবাণু এবং আর্য্যমহর্ষিগণের মতে অধর্ম্ম। অধর্ম্ম হইতেই জগতে যাবতীয় অনর্থের সৃষ্টি। অধর্ম্ম না থাকিলে রোগ-শোক-দুঃখ-দারিদ্র্য

কিছুই থাকিত না। শারীরিক অধর্ম্ম হইতেই রোগজীবাণু সকলেরও সৃষ্টি। এ কথা অবশ্য পাশ্চাত্যচিকিৎসকগণ কখনই স্বীকার করিবেন না। কিন্তু জীবাণুসৃষ্টির আদিম কারণ কি? তাহাও তাঁহারা বলিতে পারেন না। তাঁহারা বলিবেন, মূর্ত্ত জীবাণু হইতে অপর জীবাণুসকল সমুৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু সেই সর্ব্বপ্রথম উৎপন্ন আদি জীবাণুর কি প্রকারে সৃষ্টি হইল এবং তাহার প্রথমোৎপত্তির পূর্ব্বে কিরূপ মূর্ত্তি ছিল এবং এখনই বা লোকসংহারক-রূপে প্রকাশিত হইবার কারণ কি? যদি ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কি লীলাময় জগদীশ্বর লোকসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদিগকে অনন্ত দুঃখপঙ্কে নিমগ্ন করিবার জন্য, কতকগুলি জীবাণুও সৃষ্টি করিয়াছিলেন? না—সৃষ্টির বহুপরে পাপাসক্ত মানবের প্রায়শ্চিত্তের জন্য লোকনিয়ন্তা ভগবান্ অভিনব জীবাণুসৃষ্টি করিয়াছেন? এ সকল প্রশ্নের উত্তরে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ কি প্রকার উত্তর দেন, বলিতে পারি না। তবে আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে মনে হয়,—এ সকল বিষয়ের সমাধান, তাঁহাদের পক্ষে সুকর নহে। কেন না, তাঁহাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, আর আমাদের মহর্ষিগণের দৃষ্টি অপ্রতিহত ও অসীম। রোগসকলের সর্ব্বপ্রথম উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া আর্য্য মহর্ষিগণ যেখানে নিদানের শেষ করিয়াছেন, তাহার পর হইতে পাশ্চাত্য-বৈজ্ঞানিকগণের নিদানের উৎপত্তি। তাহার পূর্ব্বে কি ছিল এবং কি প্রকারে ও কেনই বা এমন হইল ইত্যাদি বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ধীশক্তি আলোকবিস্তার করিতে অক্ষম। আয়ুর্ব্বেদ যে সকল বিষয়ের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় রহস্য জগৎসমক্ষে প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন, সে সকল পাশ্চাত্যচিকিৎসাবিদ্‌গণের অবাঙ্‌মনসগোচর। যে সকল বিষয় অপহতপাপ্মা সত্ত্বসমুদ্ভাসিত চিত্তেই প্রতিফলিত হয়, সে সকল বিষয় কখনই রজোরাগরঞ্জিত অথবা তমোময়চিত্তবৃত্তিতে পরিস্ফুরিত হইতে পারে না। তাই প্রাচীন মহর্ষিগণের বাত, পিত্ত, কফাদির সূক্ষ্ম তত্ত্বসকল অদ্যাবধি তাঁহাদের বুদ্ধিগম্য হয় নাই। যাহাদের অন্তর্দৃষ্টির প্রসার নাই, তাহারা কি প্রকারে সর্ব্বাঙ্গদর্শন করিতে সক্ষম হইবে? যাহাদের বুদ্ধির তত্ত্বাভিজ্ঞতা নাই, তাহারাই কার্য্যের অব্যবহিতপূর্ব্বের কারণকে কর্ত্তা ভাবিয়া বিস্মিত হয়। সংক্রামকরোগোৎপত্তির অব্যবহিত পরে রোগীর রসরক্তাদি পরীক্ষা করিলে, বহুসংখ্যক জীবাণু পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; সেই জন্য পাশ্চাত্যচিকিৎসকগণ স্থির করিয়াছেন,—ঐ জীবাণুই যত অনিষ্টের মূল, অতএব উহাদিগকে মারিয়া ফেল। মশা ম্যালেরিয়ার বিষ বহন করিয়া বেড়ায়, ইন্দুর প্লেগের বীজাণু বহন করে, অতএব উহাদিগকে ধ্বংস কর; তাহা হইলেই রোগের প্রতীকার হইবে। কিন্তু ঐ সকল রোগ যাহাতে জন্মলাভ করিতে না পারে, সে বিষয়ে চেষ্টা করা, তাঁহারা ততটা সার্থক বলিয়া মনে করেন না। শক্তিমান্ রাজার বানভঙ্গ করিয়া দিলে তাহার গরিরোধ করিতে পারা যায় না। মশা বা ইন্দুর মারিলে সংক্রমণরোধ হইতে পারে, সংক্রামকতার নিরোধ হইতে পারে না।

কেবল আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ নহে, হিন্দুমাত্রেই জানেন,—সংসারে যাবতীয় অনর্থের মূল অধর্ম্ম। যখন সত্যযুগে অধর্ম্ম ছিল না, তখন

মানুষের দুঃখ, দারিদ্র, রোগ, শোক প্রভৃতি কিছুই ছিল না। পরে, মানব যখন, সত্য সদাচার, ধর্ম্ম প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল, অমনি তাহার দেহ পাপের নিবাসভূমি হইল। যাহার যেমন কর্ম্ম, ফলও তাহার তেমনই। অনাচার, অনাহার, অমিতাহার, অহিতাহার, অমেধ্য, অনায়ুষ্য, অস্পৃশ্য ভোজন প্রভৃতি দ্বারা শরীরে পাপ রোগ সকলও দেখা দিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে অসীম নরক যন্ত্রণার সহায়ক পাপ-রোগাণু সকলও দেহ মধ্যে জন্মিতে লাগিল এবং সেই সকল পাপীর সংস্রবে তাদৃশ পাপাচারী মানব সকল যখন মিলিত হইতে লাগিল, তখন তাহাদের দেহেও ঐ সকল পাপ-জীবাণু প্রবেশলাভ করিয়া সকলকেই ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এইজন্য আর্য্য মহর্ষিগণ নির্দ্দেশ করিলেন, শরীর সম্বন্ধে সাবধান হও, অধর্ম্ম ত্যাগ কর, অনাচার পরিহার করিয়া সদাচারে মনোনিবেশ কর, রোগদুঃখ আর থাকিবে না। তখন সকলেরই ধর্ম্মে আস্থা ছিল, দেব, দ্বিজ, গুরু, মহর্ষিগণের বাক্যে অচলা শ্রদ্ধা ছিল, সকলেই আয়ুর্ব্বেদ বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিল, পাপ সংক্রামক রোগ তিরোহিত হইল। তাই এখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে,—হরিনাম সংকীর্ত্তনে পল্লীভূমি মুখরিত হইলে আপনাআপনি সংক্রামক রোগের তিরোভাব হইয়া থাকে, অকালমৃত্যু হইতে আর ভয় থাকে না। সেই-জন্য সংক্রামকরোগের প্রসাররোধের জন্য উপদেশ, শারীর ও মানস অধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মে মতি দাও। আর এখনকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উপদেশ সংক্রামক রোগজীবাণু হইতে দূরে থাক, তোমার রোগ হইবে না।

দেখিতে পাওয়া যায়, আদিম সত্যযুগে লোকে পাপাচরণ করিত না। সেজন্য তাহা-দিগকে অশেষবিধ রোগ ভোগ করিয়া অকালে সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইত না। সকলেরই ইচ্ছামৃত্যু ছিল। সুস্থ দেহে সুদীর্ঘকাল সংসারসুখ ভোগ করিয়া যখন আর সংসারভার ভাল লাগিত না, তখন কালক্রমাগত জরাজীর্ণ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া নুতন দেহ ধারণ করিবার জন্য অথবা পরমাত্মায় বিলীন হইবার জন্য সমাধি অব-লম্বন করিয়া তনুত্যাগ করিতেন। পরে—

"যুগে যুগে ধর্ম্মপাদঃ ক্রমেণানেন হীয়তে।
গুণপাদশ্চ ভূতানামেবং লোকঃ প্রলীয়তে॥"

সুতরাং অধর্ম্ম প্রভাবে যুগে যুগে ধর্ম্মপাদ হীন হওয়ায় লোকের পাপবুদ্ধি হইতে লাগিল এবং পাপের অনুরূপ রোগ সকলও জন্মগ্রহণ করিয়া দেহকে দুঃখিত করিতে লাগিল।

"অত্যুৎকটৈঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে।"

দেব, দ্বিজ, গুরু প্রভৃতির অবমাননার জন্য এবং অমেধ্য অনুচিত আহার বিহারাদি দ্বারা পাপপূর্ণ মানবদেহ নানাবিধ পাপরোগের ক্ষেত্র হইয়া উঠিল এবং সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের আদেশে নানাপ্রকার ব্যাধিও জন্মিতে লাগিল। কালক্রমে সেই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ মানবের পুরীষ, শ্লেষ্মা, শোণিত ও মলে রোগের বীজস্বরূপ ত্বঙ্-মাংস-শোণিত-লসীকা-কোথ-ক্লেদ-সংস্বেদজাতকৃমি-কীট সকল জন্মিতে লাগিল। পরে ঐ সকল পাপরোগ-জীবাণু পাপযুক্ত দেহে সংক্রমিত

হইতে লাগিল, জগতে সংক্রামক-রোগের সৃষ্টি হইল।

এক্ষণে অনেকে বলিতে পারেন, জীবাণু সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত নহে। বীজাঙ্কুরবৎ জীবাণু সকলও লোক সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্ট হইয়া অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণের মতে যে, মূর্ত্ত জীবাণু হইতেই অপরাপর জীবাণুর উদ্ভব ঐ কথাই ঠিক। আর্য্য মহর্ষিগণ কিন্তু এ কথা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে স্বীকৃত নহেন। তাঁহারা বলেন,—অমূর্ত্ত বীজ হইতে সৃষ্টি জগতে বিরল নহে। যেমন হলুদের সঙ্গে চুণের সংমিশ্রণ হইলে বর্ণান্তরের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তেমনই সৃষ্টিসাধিকা উপাদান-সমষ্টির একত্র মিলন হইলে স্থূল বীজ ব্যতিরেকেও অভিনব নির্বীজ সৃষ্টিও হইয়া থাকে। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ময়াততমিদং বিশ্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।"

জগতে প্রত্যেক অণু পরমাণুতেই অব্যক্তভাবে সৃষ্টিকারণ ভগবানের সত্বা অর্থাৎ একটা চৈতন্যময় পদার্থ অব্যক্তভাবে বিরাজ করিতেছে। সাংখ্যের মতে তিনিই পুরুষ। সেই অব্যক্ত, অমূর্ত্ত, নিষ্ক্রিয় চৈতন্যময় পুরুষ যখন যখনই প্রকৃতির সহিত মিলিত হইতেছেন, তখন তখনই পরিব্যক্ত, মূর্ত্ত, পরিস্ফুট, সক্রিয় ও কর্ত্তা বলিয়া প্রতীত হইতেছেন। মানব যখন অমেধ্য, বিরুদ্ধ, তামসিক দ্রব্যাদি ভোজন করিতেছে, তখন তাহার দেহে ঐ সকল ভুক্ত পদার্থনিচয়ের অন্তঃস্থিত অব্যক্ত চৈতন্য বিকৃতবাতপিত্তকফময়ী প্রকৃতির সহিত সম্মিলিত হইয়া রোগজীবাণুরূপে পরিস্ফুট হইতেছে; অপর কোন জীবাণুর সহায়তার আবশ্যক করিতেছে না। সেইজন্য পাপরোগ সকলের আয়ুর্ব্বেদোক্ত নিদান পাশ্চাত্য-নিদান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এইজন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি, যেখানে আমাদের নিদানের শেষ সেখান হইতেই পাশ্চাত্য-নিদানের আরম্ভ।

নির্বীজ উদ্ভিজ্জ সৃষ্টি সম্বন্ধে রাঘবভট্ট বলেন,—

"তত্র সিক্তা জলৈর্ভূমিরন্তরুষ্মবিপাচিতা।
বায়ুনা ব্যূহমানা তু বীজত্বং প্রতিপদ্যতে॥"

অর্থাৎ জলক্লিন্ন ভূমি, স্বাভ্যন্তরস্থ উষ্মার দ্বারা বিপাচিত এবং বায়ু দ্বারা ব্যূহমান অর্থাৎ সংঘাতভাব প্রাপ্ত হইলে বীজরূপে পরিণত হইয়া থাকে। 'বিশ্বসার' ও 'প্রপঞ্চসার' নামক গ্রন্থের রচয়িতা বলেন—

"স্বেদজাঃ স্বিদ্যমানেভ্যো ভূবহ্ন্যম্ভ্যঃ প্রজায়তে।
যূকমৎকুণকীটাদ্যা যে চান্যে ক্ষণভঙ্গুরাঃ॥"—

স্বিদ্যমান অর্থাৎ অন্তরুষ্মার দ্বারা বিরচ্যমান ভূ, বহ্নি ও জল হইতে যুক, মৎকুণ প্রভৃতি বিবিধ ক্ষণভঙ্গুর কীট সকল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। কুষ্ঠে কৃমি কীট অর্থাৎ জীবাণু সকলের সমুৎপত্তি বিষয়ে মহর্ষি অগ্নিবেশ বলেন,—

"ত্বঙ্ মাংসশোণিতলসীকাকোথক্লেদসংস্বেদজাঃ ক্রিময়োঽভি-মূর্চ্ছন্তি।" এবং সুশ্রুত বলেন,—

"কৃমিকীটপিপীলিকাপ্রভৃতয়ঃ স্বেদজাঃ।"

এবং মহর্ষি আপস্তম্ব বলেন,—

"তস্মাৎ কায়াঃ প্রভবন্তি সর্ব্বে,
স মূলং শাশ্বতিকঃ স নিত্যঃ।

ঐ সকল কথারও অন্তর্নিহিত রহস্য,—

"ময়াততমিদংবিশ্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।" এবং—

"যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥"

সুতরাং নির্বীজসৃষ্টি যে জগতে অসম্ভব, এ কথা কখনই বলিতে পারা যায় না। কিন্তু ঐ সকল সৃষ্টির মূলে জগদীশ্বরের ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে বিরাজমানা আছে। তিনি যখন ইচ্ছা করিয়াছিলেন, "বহুস্যাম্ প্রজায়েন" তখনই এক অবিচ্ছিন্ন পরমাত্মা বহুরূপে ব্যক্ত হইয়াছেন। একই পুরুষ ব্যবহারভেদে শত্রু ও মিত্ররূপে পরিণত হইয়া থাকে। তাই যাহারা সদাচারপরায়ণ, ধার্ম্মিক, পবিত্রভাবে জীবন যাপন করেন, তাহাদের হৃদয়ে তিনি সঞ্জীবনরূপে বিরাজ করেন এবং যাহারা অনাচারপরায়ণ অভক্ষ্যভোজী, অধার্ম্মিক, অসংযতভাবে জীবন যাপন করে, তাহাদের হৃদয়ে তিনি পাপরোগজীবানুরূপে প্রকটিত হইয়া তাহাকে ধ্বংসের মুখে নিঃক্ষেপ করেন। যে যে ভাবে তাঁহাকে ভজনা করে, সে সেইভাবে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেইজন্যই একই ঈশ্বরকে প্রহ্লাদ জীবনদাতারূপে এবং হিরণ্যকশিপু সংহারকরূপে লাভ করিয়াছিল।

নির্বীজ পদার্থ হইতে সৃষ্টি সম্ভবপর বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে জগদীশ্বরের রাজ্যে বীজসৃষ্টি বৃথা হইয়াছে। বীজ হইতে যে, বৃক্ষাদির উৎপত্তি প্রভৃতি সৃষ্টিকার্য্য চলিতেছে, উহা স্থূলসৃষ্টি এবং অমূর্ত্ত অব্যক্ত ভাব হইতে যে মূর্ত্তবীজের সৃষ্টি, উহা সূক্ষ্মসৃষ্টি; জীবানুসৃষ্টিও সূক্ষ্ম। সেই জন্যই আয়ুর্ব্বেদের বা আর্য্যমহর্ষিগণের মতে মানুষসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সংহারক জীবানু সকলের সৃষ্টি হয় নাই, অনেক পরে হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যদি মানবের পাপাচরণে আবার অভিনব কোন প্রকার পাপরোগের আবির্ভাব হয়, তবে তাহাদেরও জীবানুসৃষ্টি হইতে পারিবে।

সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সৃষ্টিসাধক কতকগুলি কারণের একত্র সমবায় একান্ত আবশ্যক। এ কথা চরকের গর্ভাবক্রান্তি অধ্যায়ে সবিশেষ দ্রষ্টব্য। সৃষ্টিসাধিকা কারণসমষ্টির মধ্যে একটীরও কিছু ত্রুটী থাকিলে তীব্রশক্তি বীজেরও বিকাশ সম্ভবপর নহে। যদি জীবানু প্রবেশ করিলেই শরীরে রোগের সংক্রমণ হয়, তাহা হইলে পাষাণপৃষ্ঠে বীজ-বপন করিলেও নিশ্চয় বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু একথা কেহ প্রত্যক্ষও করেন নাই অথবা শ্রবণও করেন নাই। বীজ হইতে বৃক্ষোৎপত্তি সত্য হইলেও যেমন উর্ব্বর ক্ষেত্রের আবশ্যক, তেমনি জীবানু হইতে রোগোৎপত্তি সত্য হইলেও তাহার বিকাশোপযোগী বিরুদ্ধ, অহিত ও অনুচিত আহার বিহারাদি দ্বারা পরিপুষ্ট দেহেরও একান্ত আবশ্যক। নচেৎ কেবলমাত্র জীবানুর সংক্রমণের দ্বারা রোগোৎপত্তি কখনই হইবে না। সেইজন্যই অনেক সময় পরিচারকের রোগাক্রান্তি ঘটে না।

সুনিয়মিত শাস্ত্রসম্মত আহার বিহারাদি দ্বারা শরীরের এবং মনের শক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শারীরিক ও মানসিক শক্তির দ্বারা মানুষের সহ্য ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে। যাহার মনের জোর যত বেশী, সে তত শোকদুঃখাদির অত্যাচার সহ্য করিতে পারে, অপ্রিয় অনভিমত ঘটনায় বিচলিত হয় না। তদ্রূপ পবিত্র আহারে পরিপুষ্ট দেহে রোগসহনীয় শক্তিও প্রভূত পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইতে

থাকে। সেইজন্য নিঃশ্বাস প্রভৃতি দ্বারা অসংখ্য জীবাণু সকল তাহার দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেও পাষাণপৃষ্ঠ-নিহিত বীজরাশির ন্যায় কালান্তরে আপনা আপনি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইজন্য প্রাচীনমহর্ষিগণ যখনই স্বাস্থ্যরক্ষার কথা উত্থাপিত করিয়াছেন, তখনই সদ্বৃত্তের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। স্বাস্থ্যরক্ষা ও সদাচার, পরস্পর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। যদি সনাতন আর্য্যধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া স্মৃতিশাস্ত্র বিহিত তিথি অনুসারে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার করিয়া জীবনযাপন করা যায়,—তাহা হইলে আপনা আপনিই স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হইয়া থাকে অথবা যদি আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত আহারাদির বিধিনিষেধ মানিয়া চলা যায়, তাহা হইলেও অজ্ঞাতসারে আর্য্যধর্ম্ম পরিরক্ষিত হইয়া থাকে, শরীর ও মনের সামর্থ্য পরিবর্দ্ধিত হয়।

প্রাচীন মহর্ষিগণ-কথিত রোগ সকলের নিদানসমূহ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, অনুচিত আহার-বিহারাদি দ্বারা দেহে পাপ বা অধর্ম্মের সঞ্চার হয় এবং তজ্জন্য রোগোৎপত্তি ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ সংক্রামক রোগের নিদান পৃথক নির্দ্দেশ করিয়া প্রসঙ্গক্রমে রোগের সংক্রামকতা সম্বন্ধে সাবধান থাকিবার জন্য বলিয়াছেন,—

"প্রসঙ্গাদ্ গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ
একশয্যাসনাচ্চৈব মাল্যগন্ধানুলেপনাৎ ॥
জ্বরঃ কুষ্ঠঞ্চ শোষঞ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ।
ঔপসর্গিক রোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম্ ॥"

জ্বর, কুষ্ঠ, শোষ প্রভৃতি ছাড়া, আরও অনেক রোগের জীবাণু থাকিতে পারে। তবে যে সকল রোগে সংক্লেদ ও স্বেদবাহুল্য দেখা যায়, সেই সকল রোগেই সূক্ষ্ম কৃমিকীট বা জীবাণুর উৎপত্তি সম্ভবপর। কিন্তু সকল জীবাণুরই নিঃশ্বাস প্রভৃতি দ্বারা সংক্রমণ-যোগ্যতা আছে, একথা বলিতে পারা যায় না। জ্বর, কুষ্ঠ ও যক্ষ্মা প্রভৃতির সংক্রমণ-শক্তি আছে, কিন্তু সে সকল, রোগোৎপত্তির গৌণ-নিদান। মুখ্য নিদানের উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি।

আয়ুর্ব্বেদ বলেন,—"সংক্ষেপতঃ ক্রিয়া-যোগো নিদানপরিবর্জ্জনম্।" সমস্ত রোগ হইতেই বিমুক্ত হইতে হইলে, সর্ব্বপ্রথম মুখ্য-নিদানের পরিবর্জ্জন করিতে হইবে। পাশ্চাত্যবিজ্ঞান মুখ্যনিদানের ধার ধারেন না। আর মুখ্যনিদান মানিতে গেলে, তাঁহা-দিগকে পশুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া সংযত চরিত্র হিন্দু হইতে হয়। সেজন্য তাঁহারা মুখ্য বিষয় ত্যাগ করিয়া গৌণকে মুখ্যের স্থানে বসাইয়া-ছেন। তাই তাঁহারা রোগ সকলের সংক্র-মণোপায় নিরোধ করিয়া সংক্রামক ব্যাধির মূলোচ্ছেদ করিতে সংকল্প হইয়াছেন। তাঁহারা ইন্দুর মারিয়া প্লেগকে এবং মশা মারিয়া ম্যালেরিয়াকে দেশ হইতে চির-নির্ব্বাসিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যে যে কারণে বসন্ত, প্লেগ বা ম্যালেরিয়া-জীবাণুর জন্মলাভ না ঘটিতে পারে, সে বিষয়ে কোন প্রকার চেষ্টাই নাই।

যদি সংক্রামক-রোগে রুগ্ন ব্যক্তির সামীপ্য ত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে সংক্রমণ জন্য রোগেরই নিরাস হইবে,—সত্য; কিন্তু যদি রোগোৎপাদক অনুচিত আহার বিহারাদি দ্বারা দেহ বিকৃত হয়; তাহা হইলে, সংক্রামক

রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ছায়াস্পর্শ না করিলেও আপনাআপনি দেহের মধ্যে সংক্রামক-ব্যাধির উৎপত্তি হইবেই হইবে। সে সম্বন্ধে অণুমাত্র সন্দেহ নাই; এইজন্যই মহর্ষিগণের ভূয়োভূয়ঃ আদেশ,—শারীরিক ও মানসিক অধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সদাচার অবলম্বন কর, অভিমত স্বাস্থ্য ও সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিবে। নচেৎ শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করিয়া পাপাচরণ করিলে, অবশ্যই তাহার প্রতিফল গ্রহণ করিতে হইবে। তোমার আচরিত পাপকর্ম্ম দ্বারা ভগবান্ রুষ্ট হইবেন, তিনিই তোমার দেহে রোগজীবাণুরূপে স্বয়ংভূত হইয়া তোমার ধ্বংস সাধন করিবেন।

"আয়ুর্ব্বেদের" পঞ্চবর্ষ।

(কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ)

আকাশে—মুক্ত উদার বিপুল নীলিমা! বাতাসে স্নিগ্ধ স্নেহের মধুর স্পর্শ! জলে শতদলের প্রসন্ন শ্রী, স্থলে স্থলপদ্মের রাঙা হাসি! মাঠে—দিগন্তব্যাপী হরিৎ শোভা, প্রান্তরে কাশকুসুমের শুভ্র বিকাশ। দিবসে সূর্য্যালোকের দিব্যোজ্জ্বল সমারোহ, নিশায় ধবল জ্যোৎস্নার দীপালি উৎসব! নির্ম্মল নীরে স্নান করিয়া কপালে চন্দ্রতিলক পরিয়া, কণ্ঠে তারার হার দুলাইয়া; নব-কিশলয়ে লজ্জা ঢাকিয়া, শেফালী-সুরভি অঙ্গে মাখিয়া, আবার বঙ্গে লীলা চতুরা শরৎ আসিল! আশ্বিনের আসন্ন আগমনীর শঙ্খধ্বনি শুনিতে শুনিতে—আমাদের বড় সাধের "আয়ুর্ব্বেদ" পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিল!

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে—ঠিক এমনি সময়ে, জীবন তন্ত্রের "যন্ত্রলিপি" এই ক্ষুদ্র "আয়ুর্ব্বেদ" বিজ্ঞানের বিরাট যজ্ঞমণ্ডপে,—"অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের" "বিচিত্রবেদিকায়, আবাহনী ঋক্ উচ্চারণ করিতে করিতে—চির আর্ত্ত মর্ত্তালোকে অবতরণ করিয়াছিল। বাণী বিভূতি "বিরজা" ও কমলালয়া "যামিনী" —এই দুই মহাশক্তি "আয়ুর্ব্বেদের" জননী। অল্পদিন পরেই শিশু "আয়ুর্ব্বেদ", মাতৃ-অঙ্ক হইতে কর্ত্তব্য দীক্ষিতা ধাত্রী "সত্যের" স্নেহের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। এখন আর সেদিন নাই। "আয়ুর্ব্বেদ" এখন "ডাগর ডোগর" হইয়াছে, দশজনে কোলে পিঠে করিতেছে। 'ধাত্রী' এখন মাতৃ স্থানীয়া। ইহাতে আমার আনন্দ হইবারই কথা। সে আনন্দ বিগত বর্ষেই প্রকাশ করিয়াছি। আজ কিন্তু একটু শ্লাঘার কথা শুনাইতে আসিয়াছি।

বলিতে পার'—এ আমার হাস্যকর বাচালতা। "আয়ুর্ব্বেদ" ত পাঁচ বছরে পা' দিয়াছে, তবে আবার কিসের শ্লাঘা? আমার উত্তর—অনাদি অনন্তের অতি ক্ষুদ্র কালাংশ বলিয়া পাঁচকে তোমরা সামান্য ভাবিও না।

পাঁচই আয়ুর্ব্বেদের কেন্দ্র ; আয়ুর্ব্বেদের বাক্ সূত্রে, সূক্তে, ছন্দে, মন্ত্রে, অক্ষরে—এই পাঁচের প্রভাব যে বড় বেশী। প্রথমেই দেখ—পাঁচ লইয়াই এ প্রপঞ্চময় জগৎ। পাঁচে সৃষ্টি, পাঁচে স্থিতি পাঁচেই লয়। এ সকল কথা সনাতন ও পুরাতন। যে জীব-সমস্যার রহস্য ভেদ করিবার জন্য আয়ুর্ব্বেদের আবির্ভাব, সেই জীব-দেহের উৎপত্তি—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পাঁচটী মূল পদার্থ হইতে ; তাই জীবদেহ পঞ্চভূতাত্মক। শুধু ইহাই নহে। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পাঁচপ্রকার বায়ু ; পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক ও ভ্রাজক এই পঞ্চবিধ পিত্ত এবং ক্লেদন, অবলম্বন, রসন, স্নেহন, শ্লেষণ—এই পাঁচটী কফ—বিসর্গ আদান ও বিক্ষেপাদি কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া, দেহকে পালন, পোষণ ও রক্ষা করিতেছে। রোগ এই পাঁচেরই বিকার। কর্ণ, নেত্র, ত্বক্, নাসিকা ও রসনা পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ ও উপস্থ—এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়—ইহাদের দ্বারাই দেহ সর্ব্বদা পরিচালিত হইতেছে। যে আত্মাকে শাস্ত্রকারগণ দেহের কারণ বলেন, সেই আত্মার আবরণ—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময়—এই পাঁচটী কোষ। জীবনের অবসান যে মৃত্যু, তাহাকে লোকে "পঞ্চত্ব প্রাপ্তি" বলিয়া থাকে।

আর্য্যজাতির প্রথম উপনিবেশ—পঞ্চনদ প্রদেশ। তাঁহারা—ব্রহ্ম, নৃ, দৈব, পিতৃ ও ভূত এই পঞ্চযজ্ঞের এবং পাঠ, হোম, সেবা, তর্পণ ও বলি—এই পাঁচটী মহাযজ্ঞের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহাদের প্রথম কৃষিজাত পদার্থ—ধান্য, মুদ্গ, তিল, যব ও সিদ্ধার্থ—এই পাঁচটী শস্য। তাঁহাদের জীবন ধারণের উদ্দেশ্য ছিল—সষ্ঠি সামীপ্য সালোক্য সাযুজ্য ও সারূপ্য—এই পঞ্চবিধ মুক্তিলাভ।

আয়ুর্ব্বেদ ত্রিদিবলোকে অমৃতরূপে অধিষ্ঠিত ছিল। প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভরদ্বাজ ঋষি ভৌমস্বর্গ মধ্য এসিয়া হইতে এই অমৃত আহরণ করিয়াছিলেন। অগস্ত্য অশ্বিনীদ্বয় প্রমুখ ভাস্কর-শিষ্যগণ অলকানন্দার তটভূমি দিয়া দেবযানের পথে আসিয়া—এই আদি বিজ্ঞান স্রোত, ভগীরথের ভাগীরথির ন্যায় বৈবস্বত মনুর রাজধানী প্রতিষ্ঠানের স্বর্ণ সিংহাসনে পৌঁছিয়া দিয়াছিলেন। বৈদিক্ যুগ, ব্রাহ্মণযুগ, আচার্য্যযুগ, বৌদ্ধযুগ, এবং তান্ত্রিকযুগ—এই পাঁচটী যুগ আয়ুর্ব্বেদের উপর দিয়া একে একে চলিয়া গিয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে—রোগনির্ণয়ের উপায় পাঁচটী। যথা—নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয় ও সংপ্রাপ্তি। মানবদেহে যে রোগ হয়—তাহাও পাঁচ প্রকার। স্বাভাবিক, দোষজ, কর্ম্মজ, কুলজ ও আগন্তুক। চিকিৎসার অঙ্গও ৫টী—রোগী, বৈদ্য, দূত, ঔষধ ও পথ্য। কায়শুদ্ধির উপায় পাঁচটী, বমন, বিরেচন, অনুবাসন, নিরূহ, নাবন ; ইহার নাম পঞ্চকর্ম্ম। ঔষধ সেবনের কালও পাঁচটী।

প্রাণের বা শক্তির অবস্থান স্থানকে মর্ম্ম বলে। সেই মর্ম্ম—শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, মাংস এবং অস্থি এই পাঁচটীর একত্র সন্নিবেশ। মর্ম্ম আবার পাঁচভাগে বিভক্ত—সদ্যপ্রাণনাশক, কালান্তরে প্রাণনাশক, বৈকল্যকর, পীড়াকর, এবং বিশল্যঘ্ন। আমাদের প্রধান

ইন্দ্রিয় মন, গর্ভস্থ ভ্রূণ পাঁচ মাসে সেই মনের অধিকারী হইয়া থাকে।

দ্রব্যের শক্তিতে রোগ আরোগ্য হয়। সেই দ্রব্যেও রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাব এই পাঁচটী পদার্থের অস্তিত্ব থাকে। যুক্তি ব্যাপাশ্রয় চিকিৎসা প্রচারিত হইলে, প্রথমেই হরীতকীর গুণ আবিষ্কৃত হয়। সেই হরীতকী-বিশ্লেষণে পাঁচটী রসের সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রাচীন বৈদ্যগণ রোগ নিবারণের জন্য পাঁচ প্রকার কষায়ের কল্পনা করিয়াছিলেন। চলিত ভাষায় কাথ মাত্রেই "পাচন" নামে অভিহিত। পাঁচের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য—এখন অনেক পেটেন্ট ঔষধ বিক্রেতা—"কুইনাইন মিকশ্চার"কেও 'পাঁচন' বলিয়া চালাইতেছেন। সাময়িক পত্রের বিজ্ঞাপনে পাঠক ইহার পরিচয় পাইবেন।

"পঞ্চভদ্র" "পঞ্চলবণ" "পঞ্চতিক্ত" "পঞ্চ পিত্ত" পঞ্চপল্লব" "পঞ্চক্ষীরী" "পঞ্চকোল" "পঞ্চমূল" "পঞ্চতৃণ" "পঞ্চবল্লী" "পঞ্চ কণ্টক" "পঞ্চজীরক গুড়" "পঞ্চামৃত পর্পটী" প্রভৃতি মহৌষধ—আয়ুর্ব্বেদের অদ্ভুত আবিষ্কার। আর কত নাম করিব? যে দেশ "পঞ্চ দেবতার" পূজায় পবিত্র, যে দেশ "পঞ্চ উপাসকের" সাধনাক্ষেত্র, যে দেশ পঞ্চতীর্থের পঞ্চমণ্ডল, যে দেশের ব্রাহ্মণ পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন করিয়া বিশ্বের বিঘ্ন দূর করিতে পারিতেন, "পঞ্চগব্যের" দিব্য-শুচিতায় যে দেশে অতি পাষণ্ড ও পাপমুক্ত হইত, যে দেশের পঞ্চাননের পঞ্চমুখ হইতে তন্ত্র শাস্ত্রের উৎপত্তি, যে দেশে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসিয়া শক্তি-সাধক পঞ্চমকারের আরাধনা করিতেন, সেই "পঞ্চকন্যা" "পঞ্চ পাণ্ডব" "পঞ্চসিদ্ধের" দেশে—আয়ুর্ব্বেদ" যে পঞ্চবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে, এজন্য অবশ্যই একটু শ্লাঘা করিতে পারি। তবে এ শ্লাঘা আমার একার নহে,—এ শ্লাঘা আপনাদের পাঁচজনের। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ সন্তানসন্ততিকে আশীর্ব্বাদ করিতেন "শত শরৎ জীবিত থাকো"।—তাঁহাদের এই রক্ষামন্ত্র দেশবাসীকে শুনাইবার জন্য শারদোৎসবের অবাধ আনন্দের মধ্যে—আমরা পত্র-সূচনা করিয়াছিলাম। আশ্বিনের অভয়া "অকাল বোধনে" জাগিয়াছিলেন, আয়ুর্ব্বেদের মর্ম্মবাণী শুনিয়া আমার ব্যাধি-ব্যাপন্ন স্বদেশবাসী কি মোহ-নিদ্রা হইতে উঠিবে না? চাহিয়া দেখ—নিখিল দৈন্যের সহস্র বিভীষিকা হইতে মানবজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য—বৈদিক সত্ত্বার উপর চির অভয় আয়ুর্ব্বেদ! পশুশক্তি সিংহের পৃষ্ঠে দক্ষিণ পদ স্থাপিত, মোহ মহিষের স্কন্ধে বামাঙ্গুষ্ঠ, সেই মহিষ হইতে প্রকাশিত অসুর মূর্ত্তি অর্থাৎ বিলাস মত্ত ইন্দ্রিয়ের সক্রিয় তেজ! দুর্গার দশ হস্তে সর্ব্ব-ব্যাপকতা বুঝায়, আমার আয়ুর্ব্বেদও "দশমূলের" দশ হস্তে দশদিক রক্ষা করিতেছেন! দুর্গা—ত্রিনয়নী, বায়ু পিত্ত কফ—আয়ুর্ব্বেদেরও ত্রিলোচন। বামে কার্ত্তিকেয় দেব সেনাপতির মত "শাসন", দক্ষিণে গণপতির মত "বর্দ্ধন", সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতীর মত নিত্য প্রকৃতির "পালন" ও "হরণ" দুই মহাশক্তি অবস্থিত। "নব পত্রিকা"র বনৌষধি,—অপরাজিতা সূত্রে আবদ্ধ! এমন দেবতাকেও তোমরা চিনিবার চেষ্টা করিলে না? দুর্গা-পূজায় অশ্বমেধের ফললাভ, আয়ুর্ব্বেদের সাধনায়—ধর্ম্ম অর্থ

কাম ও মোক্ষের মূলস্বরূপ আরোগ্যলাভ, বিশ্বের খেলায়—এই স্বাস্থ্যের নামই "হাতের পাঁচ"।

"অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়" পাঁচ বৎসরে বৈদ্য গঠন করিতেছেন,—এ সঙ্কল্প সার্থক হউক। এসো—দেহ মন-প্রাণ-আত্মা ও প্রতিভা—এই পঞ্চোপচারে, আবার আমরা বিজ্ঞান দেবতার পূজা করি; আয়ুর্ব্বেদের অভয় চরণে শরণ লইয়া, ভাই ভাই মিলিয়া বলি—

শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণ।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহর দেব "আয়ুর্ব্বেদ" নমো৽স্তুতে॥

মনোবৃত্তি।

(ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস)

মন কি? এবং কোথায় অর্থাৎ শরীরের কিরূপ স্থানে অবস্থিত? এ কথার উত্তরে সাধারণ লোকে বক্ষঃস্থলে হাত দিয়া দেখায়। তবে কি বক্ষঃমধ্যে মনের অবস্থান? না তাহা নহে। জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, মিত্রতা, দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ, ভক্তি, স্নেহ, প্রেম, দয়া, শোক, দুঃখ, ভয়, আনন্দ, চিন্তা প্রভৃতি মনোবৃত্তি সমূহ যে যন্ত্রের ক্রিয়াদ্বারা উদ্ভূত হয়,—তাহাই মনের আধার বা মন। এই সকল মানসিক ক্রিয়া মস্তিষ্ক দ্বারা সম্পাদিত হয়। সুতরাং মস্তিষ্কই মন বা মনের আধার। এই মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অংশ আছে। তন্মধ্যে (Cerebrum) সেরিব্রম্ দ্বারা উপরোক্ত মনোবৃত্তি সমূহ সম্পাদিত হয়। অন্যান্য অংশগুলি দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, অঙ্গসঞ্চালন, স্রাব নিঃসরন, গলাধঃকরণ, শ্বাসক্রিয়া ও যান্ত্রিক মাংসপেশী সমূহের স্বতঃ পরিচালন প্রভৃতি কার্য্য সমূহের সহায়ভূত। মনোবৃত্তি বলিলে আমরা যাহা বুঝি সে সকল ক্রিয়া সেরিব্রম (Cerebrum) দ্বারা সমাধা হয়। অতএব সেরিব্রমকেই প্রকৃত মন বলা যাইতে পারে। এই সেরিব্রম ললাটফলকের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। সুতরাং মন-জ্ঞাপনার্থ বক্ষে হস্তার্পণ না করিয়া ললাটে হস্ত স্থাপনই উচিত। এই সেরিব্রমই জ্ঞানের আধার, ইহাই অবিনশ্বর আত্মার দৈহিক আবাসস্থল। সেইজন্যই বোধ হয় দেবদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কনকালে ললাট দেশে যে একটী অতিরিক্ত চক্ষু অঙ্কিত করা হয়—উহা জ্ঞানের অভিজ্ঞাপক। সাধারণ নেত্রদ্বয়ের ক্রিয়া বহির্দ্দিষ্টি, কিন্তু অন্তর্দ্দিষ্টি কেবল জ্ঞানচক্ষুদ্বারা সমাধা হয়, দেবদেবীর তৃতীয় চক্ষুটী জ্ঞানচক্ষু। জ্ঞান সেরিব্রমের কার্য্য এবং সেরিব্রমের অবস্থান ললাটদেশে, সেইজন্যই তৃতীয় চক্ষুটী ললাটদেশে অঙ্কিত হয়। তবে সাধারণতঃ লোকে মনোভাবের অভিব্যক্তির জন্য বুকে হাত দেয় কেন? ক্ষোভ প্রকাশার্থ বুক ফাটিয়া যাইতেছে বলে কেন? এ সংস্কার কোথা হইতে হইল? ইহা কি ভ্রম-সংস্কার? না তাহাও নহে। সম্পূর্ণ ভ্রম নহে। মনের

সহিত আমাদের শরীরের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। মনোভাবের উপর শরীরের অবস্থা নির্ভর করে। সতত দুশ্চিন্তায় শরীর জীর্ণ-শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এরূপ ঘটনা হইয়াছে যে; দুর্ভাবনায় একরাত্রি মধ্যে ভ্রমর-কায়সদৃশ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কেশদাম রজতাভ শুভ্রবর্ণে পরিণত হইয়াছে। শরীরের উপর মনোবৃত্তির কার্য্যকারিতা প্রদর্শনার্থ একটী গল্প প্রচলিত আছে; তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। গল্পটা এই,—এক রাজার একটী বলবান্ হস্তী ক্ষিপ্ত হইয়া নগর মধ্যে অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ করে। নাগরিকেরা প্রাণ-ভয়ে সশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। রাজা মল্ল-গণকে সেই মত্তমাতঙ্গের নিধনার্থ অনুমতি দিলেন। কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। মল্লগণ পরাজিত হইল দেখিয়া উক্ত রাজার রজক একদিন পথিমধ্যে হস্তীর পশ্চাদ্দিকের পদদ্বয় দৃঢ়রূপে ধরিয়া উহাকে শূন্যে ঘুরাইয়া নিকটস্থ এক শিলাখণ্ডে নিক্ষেপ করিল। শিলাঘাতে মস্তক চূর্ণ হইয়া মত্ত দ্বিরদের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। এই সমাচার রাজার কর্ণগোচর হইলে তিনি রজককে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। রজক রাজসমীপে উপস্থিত হইলে, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিরূপে তোমার এরূপ বলাধান হইল, কি কি বলবর্দ্ধক খাদ্য তুমি ভক্ষণ কর, এবং কোন্ মল্লের নিকট তুমি শিক্ষালাভ করিয়াছ?' রাজা এইরূপ প্রশ্ন করিলে রজক উত্তর করিল, 'মহারাজ! আমি কেবল মল্লের নিকট মল্লবিদ্যা শিখি নাই এবং বলবর্দ্ধক খাদ্যও আমার জুটিয়া উঠে না। কিন্তু হস্তীকে কেহ বধ করিতে পারিল না দেখিয়া আমার মনে হইল যে, রাজবাটীর বড় বড় অঙ্গনাস্তরণ সতরঞ্চসমূহ ধৌতকালে জলে ভিজিয়া অত্যন্ত ভারি হয়, সে সমুদয় আমি অবলীলাক্রমে উৎক্ষেপ ও নিক্ষেপ করিতে পারি, সেইরূপে চেষ্টা করিলে বোধ হয় হস্তীর বিনাশ সাধনে সক্ষম হইব। এই মনে করিয়া পশ্চাৎ হইতে ধরিয়া সজোরে প্রস্তরখণ্ডের উপর নিক্ষেপ করিয়াছিলাম।' এই কথা শুনিয়া রাজা কিছুদিন রজককে স্বীয় প্রাসাদে রাজভোগে রাখিয়া দিলেন। কিন্তু তাহার শয়নকক্ষে শয্যার উপরিভাগে একখানি তালপত্র নির্ম্মিত তরবারি এক গাছি কেশ দ্বারা ঊর্দ্ধ হইতে লম্বমান থাকিল। এই তরবারি দেখিতে অকৃত্রিম তরবারির ন্যায়, কিছুতেই তালপত্র নির্ম্মিত বলিয়া ভ্রম হয় না। রজক রাজভোগে থাকিত বটে, কিন্তু তাহার দৃষ্টি সেই তরবারির দিকে থাকিত। কখন ঐ তরবারি কেশ ছিঁড়িয়া পতিত হইয়া তাহাকে দ্বিখণ্ড করিবে সর্ব্বদা এই চিন্তা তাহার হৃদয়ে জাগরূক থাকিত। এই দুর্ভাবনায় সে দিন দিন বলহীন হইতে লাগিল। পরে রাজা একদিন তাহাকে পুনরায় হস্তী তুলিতে কহিলে সে নড়িতেও সক্ষম হইল না।

প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, হর্ষানন্দ প্রভৃতি মনোবৃত্তি যেগুলি সুভাব বলিয়া প্রসিদ্ধ সেগুলি শরীরের পক্ষে ও শারীরিক ক্রিয়াকলাপের পক্ষে হিতকর; এবং ভয়, দ্বেষ, ক্রোধ, হিংসাদি যেগুলি কুভাব বলিয়া খ্যাত সেগুলি শরীরের পক্ষে অহিতকর। এমন কি রোগাক্রমণ ও রোগমুক্তিও মনোভাবের উপর নির্ভর করে। মহামারীর সময় ভীত ব্যক্তিরা অতি সহজেই রোগাক্রান্ত হইয়া

পড়েন এবং তাঁহাদের পক্ষে আরোগ্যলাভও দুষ্কর। রোগী হতাশ হইয়া পড়িলে তাহার আরোগ্য দুঃসাধ্য। সেইজন্য রোগীকে উৎসাহ প্রদান—চিকিৎসক ও আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেরই কর্ত্তব্য। মহামারীর ভয় সম্বন্ধে উপমা সম্বলিত একটী গল্প আছে। একদা এক ভ্রমণকারী ভ্রমণ করিতে করিতে কোন নগরে উপস্থিত হইলেন। নগর প্রবেশকালে আর এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল—তিনিও নগরে প্রবেশ করিতেছেন। পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন 'যে আমি মহামারী, দশ সহস্র জীবন নাশের জন্য আমি নগরে প্রবেশ করিতেছি।' এই কথায় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ব্যাপার দেখিবার জন্য ভ্রমণকারী নগরমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দিকে ক্রন্দনের রোল উঠিল। নগর পথে সারি সারি মৃতদেহ সৎকারার্থ বাহিত হইতে লাগিল। অত্যল্পকাল মধ্যে নগর প্রায় জন-শূন্য হইল এবং প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক কালের করালকবলে নিপতিত হইল। ভ্রমণকারী এই সব দেখিয়া নগর ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইবার জন্য নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত মহামারী নগরদ্বার দিয়া বহির্গত হইতেছেন। ভ্রমণকারী জিজ্ঞাসা করিলেন 'আপনি দশ সহস্র জীবন নাশ করিতে আসিয়া পঞ্চাশ সহস্র জীবন নাশ করিলেন কেন? মহামারী উত্তর করিলেন, আমি দশ সহস্র মাত্র জীবন ধ্বংস করিয়াছি, ভীতি—অবশিষ্টগুলি ধ্বংস করিয়াছে। আবার প্রসূতির স্বাস্থ্যের ন্যায় তাঁহার মনোবৃত্তির উপরও শিশুর স্বাস্থ্য নির্ভর করে। এক জর্ম্মাণ সৈনিক সস্ত্রীক সেনানিবাসে বাস করিতেন। অন্য এক সৈনিকের সহিত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। একদা প্রথমোক্ত সৈনিক তাঁহার বাস ভবনে বিশ্রাম করিতেছেন এমন সময় হঠাৎ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। স্বামীকে নিরস্ত্র ও নিরুপায় দেখিয়া সৈনিক পত্নী ক্রোধে অধীরা হইয়া তরবারি হস্তে পতিবৈরীকে তাড়না করেন। শত্রু ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। সৈনিকপত্নী তাঁহার রোরুদ্যমান শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া স্তন্য দান করিতে লাগিলেন। তখনও তাঁহার ক্রোধের শান্তি হয় নাই; শিশু স্তন্যপান করিতে করিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। প্রসূতির স্তনদুগ্ধ পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইলে যে, বিষাক্ত মাতৃদুগ্ধ পানেই শিশুর মৃত্যু সংঘটন হইয়াছে। আজিকালি আমাদের দেশের প্রসূতিরা প্রায় ক্রোধোদয় হইলে কাহাকে কিছু বলিতে না পারিয়া শিশুপৃষ্ঠে করাঘাত করিয়া নিভৃতে বসিয়া তাহাকে স্তন্য দানে প্রবৃত্ত হন। ইহাও শিশু মৃত্যুর একটী কারণ। আমরা জানি, কোন গর্ভিণী নারী বানর কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ভয়ে মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন। প্রসবের পর শিশুরও মূর্চ্ছারোগ হইল। এককালে বিপরীত মনোবৃত্তির অভ্যুদয় শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। হর্ষ-বিষাদে দুর্য্যোধনের প্রাণবিয়োগ ইহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মনোভাবের ব্যতিক্রম হইলে যে শারীরিক ক্রিয়ার ব্যত্যয় হয়, তাহা সকলেই অত্যল্প অনুভব করিয়া থাকেন। রাগ দুঃখাদি দ্বারা অভিভূত হইলে পরিপাক ক্রিয়া ও নিদ্রার যে

ব্যাঘাত হয় তাহা বোধ হয় সকলেই জ্ঞাত আছেন। আমাদের মনোভাবের প্রথম কার্য্য হৃৎপিণ্ড ও মুখমণ্ডলে প্রকাশিত হয়। শোক-দুঃখ-ভয়াদি দ্বারা আক্রান্ত হইলে প্রথমেই হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন হইতে থাকে। সেই জন্যই বোধ হয় সাধারণতঃ লোকে মন অভিব্যক্তির জন্য বুকে হাত দেয়। বিপরীত মনোবৃত্তি প্রভাবে আকস্মিক মৃত্যুর কারণও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ারোধ।

সফল চিকিৎসা।

ম্যালেরিয়ায় কষায় প্রয়োগ

ম্যালেরিয়া জ্বরে কষায় প্রয়োগে যেরূপ সুফল পাওয়া যায়, এমন আর কোন ঔষধে নহে। কষায়-প্রয়োগ চরকের মতের চিকিৎসা, এ চিকিৎসা এখনকার দিনে নানা কারণে কলিকাতায় তো বটেই, মফঃস্বলেরও অনেক স্থানে উঠিয়া গিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ, এখনকার চিকিৎসকেরা অর্থ লোলুপ হইয়াছেন; কষায়ের ব্যবস্থা করিলে ঔষধের মূল্য পাইবার উপায় নাই। ২য় কারণ এখনকার রোগীরাও আর সেকালের মত কোনোরূপ ঝঞ্ঝাট স্বীকার করিতে রাজি নহেন। আমরা এখন অনেক চিকিৎসকের কথা জানি, যাঁহারা রোগীদিগকে ঐ ঝঞ্ঝাটের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দিয়া ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধির জন্য অনেক ঔষধের অনুপান প্রয়োগ করিতেও ইচ্ছা করেন না। কিন্তু ইহার ফল হইতেছে যে, ব্যবস্থেয় ঔষধে যতটা সুফল লাভের সম্ভাবনা, অনেক স্থলে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের পক্ষে ইহা কিন্তু গৌরবের কথা নহে। সে কালে বনজঙ্গল কুড়াইয়া ঔষধি দ্রব্য সংগ্রহ করাই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় প্রচলন ছিল এবং সেইজন্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ সে কালে ঋষিকল্প চিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত হইতেন। থাক্, সে সব কথার আলোচনা সময়ান্তরে করিব। এখন ম্যালেরিয়া জ্বরে কষায় প্রয়োগে আমি অনেক স্থলে কিরূপ সুফল পাইয়াছি তাহারই ২।১টী পরিচয় এখানে প্রদান করিতেছি।

সে আজ অনেক দিনের কথা। আমি তখন রাণাঘাটে চিকিৎসা করিতাম। রাণাঘাট সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক ছিলেন তখন শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন। তিনি এখন পেন্সন লইয়া চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

কালী বাবু যদিও গবর্ণমেণ্টের পাস করা ডাক্তার ছিলেন কিন্তু ডাক্তারীর গোঁড়ামি তাঁহার মোটেই ছিল না, জাতিতে তিনি বৈদ্য—তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণও বৈদ্যবৃত্তি করিয়া গিয়াছেন। কাজেই বংশগত অভ্যাসে

তিনি ডাক্তারী অপেক্ষা কবিরাজীর কৃতকার্য্যতা অনেক স্থলেই স্বীকার করিতেন। হাঁসপাতালের যে সব রোগী ডাক্তারী ঔষধে ফল পাইত না, তাহাদিগকে তিনি কবিরাজী চিকিৎসার পরামর্শ প্রদান করিতেন। আমার উপর তাঁহার একটু শ্রদ্ধা ছিল, অনেক সময় কবিরাজী চিকিৎসার পরামর্শ দিয়া রোগীকে আমারই শরণাপন্ন হইতে বলিয়া দিতেন।

একদা কালী বাবুর নাম করিয়া একটি রোগী আমার নিকট আসিল। ২ বৎসর হইতে সে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে, প্লীহা ও যকৃৎ বিবৃদ্ধ, শরীর যথেষ্ট শীর্ণ—এক কথায় অস্থিচর্ম্মসার।

জ্বর তাহার নাড়ী হইতে ছাড়িত না, সকালে কম পড়িত; কিন্তু বৈকালে আবার তাহা ফুটিয়া ১০৩° পর্য্যন্ত হইত। দুই বৎসরের মধ্যে একদিনও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। লোকটি গরীব।

আমি কতকটা গরীব বলিয়াও বটে, কতকটা শীঘ্র ফল দেখাইবার জন্তও বটে তাহাকে কতকগুলা ঔষধের ব্যবস্থা না করিয়া, ব্যবস্থা করিলাম—প্রাতে * বৃহজ্জরাঙ্কুশ—পিপুলের গুঁড়া মধু, বেলা ৮টায় ও ৩টায় বৃহদ্দুর্গাদি পাচন, সন্ধ্যায় নবায়স লৌহ—কুলেখাড়ার রস মধু।

১ সপ্তাহের ঔষধ দিলাম। আশ্চর্য্য উপকার। রোগী এক সপ্তাহ পরে আমার নিকটে আবার যখন আগমন করিল, তখন তাহার চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, জ্বর বন্ধ হইয়া গিয়াছে, প্লীহা কমিয়া গিয়াছে, যকৃতের দোষও নাই বলিলেই চলে, দাস্ত পরিষ্কার হইতেছে, ক্ষুধাও বাড়িয়াছে। আমি নিজেই এক সপ্তাহের মধ্যে তাহার এতটা উপকার হইবে আশা করি নাই।

২য় সপ্তাহেও ঐ ব্যবস্থা বজায় রাখিলাম। ৩য় সপ্তাহে বৃহজ্জরাঙ্কুশ বন্ধ করিয়া কেবল নবায়স-মকরধ্বজ ও পাচনটির ব্যবস্থা রাখিলাম, ৪র্থ সপ্তাহে ঔষধ বন্ধ করিয়া কেবল পাচনটী খাইবার পরামর্শ দিলাম,—এইরূপে এক মাসের মধ্যে রোগী সম্পূর্ণরূপে যখন সারিয়া আমার নিকটে আসিয়া আমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল—তখন আর আমার আনন্দের সীমা রহিল না।

আর একটী রোগীর কথা বলি—এটী প্রায় পাঁচ বৎসরের শিশু। শিশুটীর পিতার নাম শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র। নিবাস ছিল নদীয়া জেলার উলা বা বীরনগর গ্রামে। উলার বিখ্যাত ম্যালেরিয়ায় লোকশূন্য হওয়ার জন্য তিনি রাণাঘাটে বাড়ী ক্রয় করিয়া রাণাঘাটের অধিবাসী হন। তাঁহার নূতন খরিদা-বাটীখানি ছিল আমারই ডিস্পেন্সারির ঠিক সম্মুখে। লোকটী অর্থসম্পদে ভাগ্যবান হইলেও বংশরক্ষার আশঙ্কায় বড় মনোকষ্টে কাটাইতেন, কারণ তাঁহার যতগুলি পুত্র সন্তান হইয়াছিল, একটীও রক্ষা পায় নাই, Infant leaver বা শিশু-যকৃত রোগে তাঁহার অনেকগুলি সন্তান মৃত্যুমুখে

---

* শাস্ত্রে জ্বরাঙ্কুশ নামধেয় ঔষধ অনেকগুলি আছে, বিশেষতঃ এই ঔষধটি আমাদের নিজেদের ঘরের, সেইজন্য বৃহজ্জরাঙ্কুশের ফর্দ্দটি লিখিত হইল।

রস—২ তোলা
গন্ধক—২ তোলা
শুঁঠ—১ তোলা
সোহাগার খই—১ তোলা
হরিতাল—১ তোলা
অমৃত—১ তোলা

তিন দিবস ভৃঙ্গরাজ রসে ভাবনা দিয়া চণক প্রমাণ বটী।

পতিত হয়। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে তাঁহার একমাত্র প্রায় পঞ্চম বর্ষীয় সন্তান তাঁহার পরলোকগত কন্যাও পুত্রের মত একইরূপ রোগে ভুগিয়া তাঁহার দুশ্চিন্তাস্রোত বৃদ্ধি করিতেছিল।

একমাত্র বংশধরের জীবন রক্ষার জন্য তিনি ডাক্তারী চিকিৎসায় যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। যকৃতবিবৃদ্ধ এবং সারাদিনব্যাপী ঘুসঘুসে জ্বর—এ আর কিছুতেই ত্যাগ করিত না। হেম বাবুর পত্নীর ইচ্ছা হইল—ডাক্তারী ছাড়িয়া কবিরাজী চিকিৎসা করান হয় এবং সে চিকিৎসার ভার আমি গ্রহণ করি। ফলে আমার হাতেই হেম বাবুর একমাত্র বংশধরের চিকিৎসার ভার অর্পিত হইল।

আমি তাহাকে ব্যবস্থা করিলাম—* যকৃদরি লৌহ—আট ভাগের এক ভাগ মাত্রায় প্রাতে ১ বার কুলেখাড়ার রস ও মধু এবং নিম্নলিখিত পাচন—

শুলঞ্চ (গাঁটবাদ)
নিমের শিকড়ের ছাল।
পল্‌তা (নতি)
ক্ষেৎপাঁপড়া।
রক্তচন্দন।
চিরাতা।
কট্‌কী।
হরীতকী (আঁটি বাদ)।

প্রত্যেক দ্রব্য ।০ আনা, জল /॥০ সের, শেষ ৵০, ইহার ১ ঝিনুক মাত্র বেলা ৩টার সময় মধু মিশাইয়া সেব্য, বাকীটুকু ফেলিয়া দেওয়া হইবে।

ভগবানের কৃপায় এই ব্যবস্থার ৪ দিনের পরই শিশুটির আর জ্বর বুঝা গেল না। এইরূপে ২ সপ্তাহ ঔষধ ও কষায় সেবনের পর শিশুটি সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হইল।

যে পাচনটিতে শিশুটি আরোগ্য হইয়াছিল এ পাচনটি আমি ম্যালেরিয়াক্রান্ত বহুল রোগীকেই ব্যবস্থা করিয়া থাকি এবং সকল স্থলেই সুফল প্রাপ্ত হই। আয়ুর্ব্বেদের পাঠক-বর্গ ইহা অসঙ্কোচে ব্যবহার করিতে পারেন।

মফঃস্বলে থাকিতে আমি ম্যালেরিয়া জ্বরের অনেকগুলি রোগী দেখিয়াছি। আলোচ্য প্রবন্ধে বৃহজ্জ্বরাঙ্কুশ যে রোগীটার জন্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম তাহার উপকার হইয়াছিল—কতকটা বৃহজ্জ্বরাঙ্কুশে এবং কতকটা বৃহস্তার্গাদি পাচনে। বৃহজ্জ্বরাঙ্কুশ না দিয়া যদি শুধু পাচনটিরই ব্যবস্থা করা হইত—তাহা হইলেও আমার বিশ্বাস—এই একমাত্র পাচনেই রোগ আরোগ্য হইত। আমার বিশ্বাস, রোগ আরোগ্যের জন্য কতকগুলি ঔষধের একত্র প্রয়োগ ভাল নয়, তাহাতে সুফল অপেক্ষা অনেক স্থলে কুফল হইয়া থাকে।

যদি পাচন চিকিৎসা আবার দেশে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে তদ্বারা রোগীর রোগ আরোগ্যের যেরূপ শীঘ্র সম্ভাবনা, সেইরূপ উহার ফলে রোগীর পক্ষে ব্যয়ের মাত্রাও অনেক কমিয়া যায়। আমাদের দেশের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ একথা চিন্তা করিবেন কি ?

* ইহা প্রস্তুতের নিয়ম—লৌহচূর্ণ ৪ তোলা, অভ্র ২ তোলা, তাম্র ২ তোলা, পাতিলেবুর মূলের ছাল ৮ তোলা ও মৃগচর্ম্ম ভস্ম ৮ তোলা জল দিয়া মর্দ্দন।

কায়চিকিৎসা-ক্রমোপদেশ

বা

Practice of Medicine.

ব্যাধেস্তত্ত্ব পরিজ্ঞানং বেদনায়াশ্চ নিগ্রহঃ
এতদ্বৈদ্যস্যবৈদ্যত্বং নবৈদ্যঃ প্রভুরায়ুষঃ।

ব্যাধির তত্ত্ব অবগত হইয়া উপদ্রব দূর করাই চিকিৎসকের বিশেষত্ব, চিকিৎসক কখন আয়ুর প্রভু নহেন।

এ অবস্থায় আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি —রোগের যে সব বাঁধা ঔষধ আছে—সকল স্থলে সে সকলের দ্বারা চিকিৎসা করা যায় না। ব্যাধির তত্ত্ব অবগত হইয়া শাস্ত্রোক্ত অধিকারের ঔষধ ছাড়াও প্রয়োজন মত অন্য ঔষধ দ্বারা ব্যাধির উপদ্রব দূর করিবার আবশ্যক হয়।

প্রথমতঃ জ্বর লইয়া আলোচনা করা যাউক। কষায় প্রয়োগ ছাড়া জ্বরে শাস্ত্রকারগণ দেড় শতেরও অধিক ঔষধ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু সেই দেড় শত ঔষধই যে সকল জ্বরের সকল অবস্থায় প্রয়োগ করিতে হইবে—এবং তাহার ফল সকলস্থলেই শুভ হইবে—এমন কথা কিছু নাই। অবশ্য শাস্ত্রকার ঐ দেড়শত ঔষধের মধ্যে জ্বরের শ্রেণী বিভাগ করিয়া ঔষধগুলির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন ইহাও সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও এত জটিলভাবে সেই সকল বিষয় লিপিবদ্ধ যে, তাহা দ্বারা সুষ্ঠু উপলব্ধি হয় না। আবার অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় যে, জ্বর হইয়াছে, জ্বরের যে সকল উপসর্গ সে সকল রহিয়াছে অথচ তাহার সহিত অন্য রোগ আসিয়া জুটিয়াছে, যেমন শোথ, পাণ্ডু, উদরাময়, অরোচক ইত্যাদি। সে ক্ষেত্রে জ্বরাধিকারের ঔষধগুলি জ্বরে ব্যবস্থা করিতে হয়—এই ধারণা রাখিয়া শুধু সেই সকল ঔষধের ব্যবস্থা করিলেই চলিবে না। এই জন্যই practical শিক্ষা একান্ত আবশ্যক, এই practical শিক্ষা গ্রন্থ পড়িয়া শুধু হইবার উপায় নাই।

শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,

জ্বরিতং ষড়তেহতীতে লঘ্বন্ন প্রতিভোজিতম্
পাচনং শমনীয়ং বা কষায়ং পায়য়েত্তম্।

অর্থাৎ জ্বরের ছয়দিন অতীত হইলে সপ্তম দিবসে রোগীকে লঘু অন্ন (যবাগূ প্রভৃতি) ভোজন করাইয়া অষ্টম দিবসে পাচন বা শমন কষায় ব্যবস্থা করিবে কিন্তু

সপ্তাহাৎ পরতোঽস্তব্ধে সামে স্যাৎ
পাচনং জ্বরে
নিরামে শমনং স্তব্ধে সামে মৌষধমাচরেৎ।

অর্থাৎ সপ্তাহের পর আম রসের সম্যক পরিপাক না হইলে পাচন এবং নিরাম অবস্থায় (আম সম্যক পরিপাক হইলে) শমন ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। যদি আমরসের পরিপাক না হয়, তবে পাচন কি শমন কোন প্রকার ঔষধই প্রয়োগ করিবে না, কারণ আমরসের অপক অবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ

করিলে উহা পরিপাক না হইয়া জ্বরের বেগ আরও বৃদ্ধি করে।

কিন্তু সকল ক্ষেত্রে শাস্ত্রের এ উক্তি মান্য করিয়া চলিলে হিতে বিপরীত হইয়া থাকে। যেমন প্লেগ, যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা, যেমন ম্যালেরিয়ার উৎকট অবস্থা। এ সব জ্বরে যদি শাস্ত্রের ঐ কথা সিদ্ধান্ত করিয়া ৬ দিন পর্য্যন্ত ঔষধ প্রয়োগ না করা যায়, তাহা হইলে রোগীর তাহার মধ্যেই পঞ্চত্ব পাইবার কথা। অবশ্য সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারগণ এ সকল কথা চিন্তা করিয়া এ সম্বন্ধে নিষ্পত্তিও করিয়া দিয়াছেন,—

ন দোষাণাং ন রোগাণাং
ন পুংসাঞ্চ পরীক্ষণম্।
ন দেশস্য ন কালস্য কার্য্যং
রস চিকিৎসিতে॥

অর্থাৎ রসচিকিৎসা বিষয়ে দোষ, রোগ, ব্যক্তি, দেশ ও কাল ইহার কিছুই পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই।

যাহা হউক সকল বিষয় বিবেচনা করিলে নবজ্বরে ঔষধ প্রয়োগ সম্বন্ধে সাত দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া আট দিনের দিন শমন বা পাচন প্রয়োগ করিলে এখনকার দিনে আর চলিতে পারে না। যে সময় মানবের নির্দ্দিষ্ট পরমায়ুর পূর্ব্বে প্রায়শঃই লোক মরিত না, পাপের ফলে রোগ হইত এবং সে পাপক্ষয়ে রোগ আপনাপনিই পলাইয়া যাইত, তখন ঐরূপ ব্যবস্থা ছিল। এখন আমরা দণ্ডে দণ্ডে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এত পাপ করি, যে সে পাপের ক্ষয় সহজে হইবার কথা নহে। এখনকার মানুষ চিররুগ্নও এইজন্য। যাহা হউক এখনকার দিনে জ্বর হইলে ৭ দিন পর্য্যন্ত কোন ঔষধ না দিয়া ফেলিয়া রাখার বড় একটা রীতি নাই।

জ্বর উৎপত্তির কারণে আমরা দেখিতে পাই,—

মিথ্যাহার বিহারাভ্যাং দোষাহ্যামাশয়াশ্রয়াঃ।
বহির্নিরস্য কোষ্ঠাগ্নিং জ্বরদাঃস্যু রসানুগাঃ॥

অর্থাৎ অমিত আহার ও বিহারাদির ফলে বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া আমাশয় নামক স্থানে গমন করে তথায় আমরসকে দূষিত ও কোষ্ঠের অগ্নিকে বাহিরে নিঃক্ষিপ্ত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। এরূপ অবস্থায় যদি আমরা আমদোষ শান্তির জন্য জ্বরাধিকারের ঔষধ ছাড়া অন্য ঔষধ ব্যবস্থা করি, তাহা হইলে তদ্দ্বারা তরুণ জ্বরে অনিষ্ট না হইয়া শুভফলই হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় 'রামবাণ'-নামক অগ্নিমান্দ্য অধিকারের ঔষধটির প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ। আটপ্রকার জ্বরের মধ্যে যে প্রকারের জ্বরই হউক না, সকলেরই মূলে বাতাদি দোষ যখন সমাশ্রিত, তখন সেই দোষ নিবারক রামবাণ প্রয়োগে কোনো অনিষ্টেরই কারণ দেখা যায় না। আর তা' ছাড়া এখনকার দিনে রোগীও চিকিৎসক ডাকিয়া তিনি ১ সপ্তাহ পর্য্যন্ত রোজ দু'বেলা করিয়া আসিবেন ও ৭ দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ঔষধ দেওয়া যাইবে বলিয়া চলিয়া যাইবেন—ইহার জন্য অপেক্ষা করিতে পারে না। রোগী চাহে—উৎকট যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইতে, নানারূপ উপদ্রবের হাত হইতে মুক্তি পাইতে—শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিতে। এমন অবস্থায় ঔষধ না দিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন? এইজন্য আমরা ব্যবস্থা করিতেছি—তরুণ জ্বরের সকল অবস্থায় দু' একদিন জ্বর ভোগের পরই অগ্নিমান্দ্য অধিকারোক্ত

রামবাণ সমস্ত দিনে ২।৩বার প্রয়োগ করিবে। উহার অনুপান অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে হইবে। যথা বায়ুজন্য জ্বরে চিনি ভিজান জল, পিত্তজন্য জ্বরে সেঁকা পটোলের রস। শ্লেষ্মাজন্য জ্বরে তুলসীর পাতার রস, বিল্বপত্রের রস, আদার রস ইত্যাদি।

সকলপ্রকার তরুণ জ্বরের প্রথমাবস্থায় কেবল বিল্বপত্রের রস গরম করিয়া গেঁজলা বাদ দিয়া, শীতল হইলে একটু মধু মিশাইয়া সেবন করা মন্দ ব্যবস্থা নহে, ইহাতে অনেক সময় বেশ ফল পাওয়া যায়।

২।১ দিন রামবাণ প্রয়োগের পর রোগের অবস্থা বুঝিয়া অন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয়। শাস্ত্রকারগণ বাতিক জ্বরে হিঙ্গুলেশ্বর ব্যবস্থা করিয়াছেন কিন্তু এই হিঙ্গুলেশ্বর শুধু বাতিক জ্বর ভিন্ন অন্য জ্বরে যে প্রয়োগ করিবে না—এমন কথা নাই। হিঙ্গুলেশ্বরের উপাদান গুলিতে আমরা অবগত হই, হিঙ্গুল, পিঁপুল ও মিঠা বিষ—সমান ভাগে লইয়া জল দ্বারা মাড়িয়া এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয়। এখন দেখা যাউক এই কয়টি উপাদানের গুণ কি? হিঙ্গুলের গুণ—

তিক্তং কষায়ং কটু হিঙ্গুলং স্যাৎ
নেত্রাময়ঘ্নং কফপিত্তহারি।
হৃল্লাস কণ্ডু জ্বর কামলাশ্চ
প্লীহামবাতৌ চ গরং নিহন্তি॥

অর্থাৎ শোধিত হিঙ্গুল তিক্ত, কষায়, কটু, নেত্ররোগ নিবারক, কফ পিত্ত বিনাশক ও বিষঘ্ন। ইহা দ্বারা হৃল্লাস, কণ্ডু, জ্বর, কামলা, প্লীহা ও আমবাত প্রশমিত হয়।

পিপুলের গুণে অবগত হওয়া যায়,

পিপ্পলী দীপনী বৃষ্যা স্বাদুপাকা রসায়নী
অনুষ্ণা কটুকা স্নিগ্ধা বাতশ্লেষ্মহরী লঘুঃ।
পিপ্পলী রেচনী হন্তি শ্বাস কাসোদর জ্বরান্।
কুষ্ঠ প্রমেহ গুল্মার্শঃ প্লীহ শূলামমারুতান্॥

অর্থাৎ পিপ্পলী অগ্নি দীপ্তিকারক, বলকারক, পাকে মিষ্ট রস, রসায়ন, অনুষ্ণ, কটু, স্নিগ্ধ, বাতশ্লেষ্মনাশক, লঘু ও রেচক। শ্বাস, কাস, উদরাময়, জ্বর, কুষ্ঠ, প্রমেহ, গুল্ম, অর্শ, প্লীহা, শূল ও আমবাত—এই সমুদয় রোগে ইহা হিতকর।

অমৃত বা মিঠা বিষের গুণ,—

নেপালশৃঙ্গী নৈপালী হন্তি সা
কফজান গদান্।
বাতজান্ নিখিলাংশ্চাপি
সন্নিপাতোদ্ভবং জ্বরম্॥
আমবাতং মহাঘোরঃ হৃদ্রোগমপি
দারুণম্।

এই মিঠা বিষের অন্য নাম নেপালশৃঙ্গী বা নৈপাল। নেপাল রাজ্যে এবং তন্নিকটবর্ত্তী হিমালয় পর্ব্বতে ইহা জন্মিয়া থাকে। ইহা সেবনে বাতজ ব্যাধি সকল এবং সান্নিপাতিক জ্বর, আমবাত ও হৃদ্রোগের শান্তি হয়।

আমরা হিঙ্গুলেশ্বরে যে তিনটি দ্রব্য পাইতেছি, সেই তিনটির ১মটি প্রধানতঃ কফ ও পিত্ত প্রশমক, ২য়টি বাতশ্লেষ্মনাশক এবং তৃতীয়টি ত্রিদোষনাশক। এ অবস্থায় শাস্ত্রকারগণ হিঙ্গুলেশ্বরকে বাতিক জ্বরের ঔষধ বলিয়া গাইলেও সকলপ্রকার জ্বরেই অবস্থা বিবেচনায় এ ঔষধের ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। তরুণ জ্বরে ২।১দিন রামবাণ প্রয়োগের পর এই হিঙ্গুলেশ্বর দোষের প্রকোপ বিবেচনায় উপযুক্ত অনুপানের ব্যবস্থাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে।

সাধারণতঃ কোনো দুইটী দোষের মিশ্রণে জ্বর উৎপত্তি হয়। যেমন বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ইত্যাদি। যেখানে পিত্তের প্রকোপ অধিক, সেখানে সিউলির পাতার রস, গুলঞ্চের রস, সেঁকা পটোলের রস—মন্দ অনুপান নহে। যেখানে শ্লেষ্মার আধিক্য, সেখানে পানের রস, তুলসীর পাতার রস, আদার রস—উত্তম ব্যবস্থা।

বাতিক জ্বরে হিঙ্গুলেশ্বরের অনুপান মধু-সহ, চিনি ভিজান জলসহ। তবে বাতিক জ্বর খুব কমই হয় এবং বাতিক জ্বর হইলে সে রোগীর চিকিৎসার ভারও আমরা কমই পাইয়া থাকি, সুতরাং সেজন্য বড় বেশী ভাবিতে হইবে না।

তবে সকল প্রকার জ্বরে হিঙ্গুলেশ্বর প্রয়োগের একটা আপত্তি আছে যে, হিঙ্গুলেশ্বরের ২য় উপাদান শুষ্ক পিপ্পলী—একটু পিত্তবর্দ্ধক। * আর্দ্র পিপ্পলী ও কফপ্রদ, কিন্তু ঔষধে আর্দ্র পিপ্পলী তো প্রয়োগের ব্যবস্থা নাই, সুতরাং সে চিন্তাও নাই।

যাহা হউক যেখানে পিত্তের প্রকোপ বর্ত্তমান, সেখানে রামবাণ দেওয়ার পর হিঙ্গুলেশ্বরের ব্যবস্থা নাই করা হইল। সেখানে ব্যবস্থা কর—মৃত্যুঞ্জয় রস। মৃত্যুঞ্জয়ের উপাদান—

বিষস্যৈকস্তথা ভাগো মরিচঃ পিপ্পলীকণঃ।
গন্ধকস্ত তথা ভাগো ভাগঃস্যাৎটঙ্কনস্য চৈব॥
সর্ব্বত্র সমভাগঃ স্যাং দ্বিভাগং হিঙ্গুলং ভবেৎ।
জম্বীরস্য রসেনাত্র হিঙ্গুলংভাবয়েদ্ভিষক্॥

অর্থাৎ মিঠে বিষ বা অমৃত, মরিচ, পিঁপুল, গন্ধক, সোহাগার খই—সমান ভাগ এবং হিঙ্গুল (লেবুল রসে হিঙ্গুলকে ভাবনা দিয়া লইবে) ২ ভাগ—একত্র মিশাইয়া জল দ্বারা বাটিয়া মুগ প্রমাণ বটি করিবে।

এখন দেখা যাউক—এই উপাদানগুলির গুণ কি?

বিষ বা অমৃতের গুণে আমরা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি—ইহা ত্রিদোষনাশক। মরিচের গুণ—

মরিচং কটুকং তীক্ষ্ণং দীপনং কফবাতজিৎ
উষ্ণং পিত্তকরং রুক্ষং শ্বাস শূল ক্রিমীন্ হরেৎ।

অর্থাৎ মরিচ,—কটু, তীক্ষ্ণ, দীপন, বায়ু ও শ্লেষ্মানাশক, উষ্ণ, পিত্তকারক ও রুক্ষ। ইহা সেবনে শ্বাস, শূল ও ক্রিমী দূর হয়।

পিঁপুলের গুণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে,—এক কথায় ইহা বাতশ্লেষ্ম নাশক।

গন্ধকের গুণ *—

গন্ধকঃ কটুকস্তিক্তো বীর্য্যোষ্ণস্তুবরঃসরঃ।
পিত্তলঃ কটুকঃ পাকে কণ্ডূ বীসর্পজন্তুজিৎ॥
হন্তি কুষ্ঠ ক্ষয়প্লীহকফবাতান্ রসায়নম্॥

অর্থাৎ গন্ধক কটু, তিক্ত, কষায়, উষ্ণ-বীর্য্য, সারক, পিত্তকর, কটুপাক ও ক্রিমিঘ্ন। ইহা সেবনে কুষ্ঠ, ক্ষয়, প্লীহা, কফ ও বাতজ ব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে এবং ইহা রসায়ন।

---

* আর্দ্রা কফপ্রদা স্নিগ্ধা শীতলা মধুরা গুরুঃ।
পিত্তপ্রশমনী সা তু শুষ্কা পিত্তপ্রকোপিনী।

* গন্ধককে অবশ্যই নিম্নলিখিত ভাবে শোধন করিয়া লইতে হইবে যথা,—লৌহ পাত্রে বিনিক্ষিপ্য ঘৃতমধ্যে প্রতাপয়েৎ। তপ্তে তপ্তে তৎ সমানং ক্ষিপেদ্ গন্ধকজং রজঃ। বিদ্রুতং গন্ধকং জ্ঞাত্বা দুগ্ধ মধ্যে বিনিক্ষিপেৎ।

টঙ্কনের গুণ—

টঙ্কনোঽগ্নি কয়োরুক্ষঃ কফঘ্নো বাতপিত্তকৃৎ।

অর্থাৎ টঙ্কন—অগ্নিকারক, রুক্ষ, কফঘ্ন ও বায়ু পিত্ত জনক।

হিঙ্গুলের গুণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা প্রধানতঃ পিত্ত নাশক।

এ অবস্থায় এই ঔষধের উপাদান গুলির মিশ্রণে প্রধানতঃ সর্ব্বপ্রকার জ্বরই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। তবে অবস্থা বিবেচনায় অনুপানের ব্যবস্থা চাই। শাস্ত্রই সে অনুপানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন,—

মধুনা লেহনং প্রোক্তং সর্ব্বজ্বর নিবৃত্তয়ে।
দধ্যুদকাম্বু পানেন বাতজ্বর নিবর্হণঃ।
আর্দ্রকস্য রসৈঃ পানং দারুণে সান্নিপাতিকে।
জম্বীর রস যোগেন অজীর্ণ জ্বরনাশনঃ।
অজাজী গুড় সংযুক্তো বিষম জ্বরনাশনঃ।

অর্থাৎ মধুর সহ সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর, দধির মাত অনুপানে বাতজ জ্বর, আদার রসে সান্নিপাতিক জ্বর, জম্বীর রসে অজীর্ণ জনিত জ্বর, কৃষ্ণজীরা চূর্ণ ও পুরাতন গুড় সহ অনুপানে বিষম জ্বর নষ্ট হয়। অতএব ২।৩ দিন জ্বর ভোগের পর যদি এই মৃত্যুঞ্জয় দিবসে ২।৩ বার করিয়া নবজ্বরের সকল অবস্থায় রোগীকে ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে ইহা দ্বারা জ্বরবেগ যে কমিয়া থাকে—তাহা সুনিশ্চিত।

এই মৃত্যুঞ্জয়ে কেহ কেহ হিঙ্গুলের পরিবর্ত্তে কজ্জলী প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন। ইহা অতি উত্তম ব্যবস্থা। আমরা নিজেরা হিঙ্গুলের পরিবর্ত্তে কজ্জলী দিয়া 'শূলপাণি' নামে কালমৃত্যুঞ্জয় অনেক স্থলেই ব্যবস্থা করিয়া থাকি এবং তরুণ জ্বরে ডাক্তারদের ফিবার মিকশ্চারের মত তদ্দারা যথেষ্ট সুফলও পাইয়া থাকি। শাস্ত্রও সে বিধি দিয়াছেন, যথা—

"রসস্চেৎ সমভাগঃস্যাৎ হিঙ্গুলং নেষ্যতে তদা।"

'পঞ্চানন রস' নামে যে ঔষধটি ভৈষজ্য রত্নাবলীর 'মধ্য জ্বরাদৌ'—চিকিৎসায় লিখিত, সে ঔষধটি সাধারণ তরুণ জ্বরে ১ সপ্তাহ পরে বিকৃতি অবস্থার কোনো লক্ষণ না ঘটিলে ডাক্তারদের ফিবার মিকশ্চারের মত ব্যবস্থা করা যায়। ইহার উপাদান—

শম্ভোঃকণ্ঠবিভূষণং সমরিচং
দৈত্যেন্দ্র রক্তং রবিঃ।
পক্ষৌ সাগর লোচনং শশীযুতং
ভাগোঽর্ক সংখ্যান্বিতঃ॥

অর্থাৎ বিষ, ২ তোলা, মরিচ ২ তোলা গন্ধক ৪ তোলা, হিঙ্গুল ৩ তোলা এবং তাম্র ১তোলা। আকন্দমূলের রসে মর্দ্দন। ১ রতি প্রমাণ বটী।

এই পঞ্চানন রস সেবনে প্রবল জ্বর মগ্ন হইয়া থাকে এবং জ্বরের মগ্নাবস্থায় ইহা ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ২ বার সেবন করাইলে পুনরায় জ্বর আসিবার সম্ভাবনাও থাকে না।

কেহ কেহ জ্বরের মগ্নাবস্থায় ইহার সহিত মকরধ্বজ ১ রতি মিশানর ব্যবস্থা করেন। আমরাও অনেক স্থলে সে ব্যবস্থা করিয়া ফল পাইয়াছি।

পঞ্চাননের মত হিঙ্গুলেশ্বরও জ্বরের মগ্নাবস্থার ২।৩ বার সেবনের ব্যবস্থা করিলে ২।৩ দিনে জ্বর বন্ধ হইয়া থাকে।

ডাক্তারী কুইনাইন সেবনে যেমন শরীর গরম হয়, পঞ্চানন রস সেবনেও সেইরূপ শরীর গরম হইয়া থাকে, কারণ ইহা অত্যন্ত উগ্রবীর্য্য ঔষধ। ইহার উপাদান গুলির মধ্যে বিষ ত্রিদোষ নাশক, মরিচ বায়ু ও শ্লেষ্মা

নাশক, গন্ধক উষ্ণবীর্য্য ও পিত্তঘ্ন, হিঙ্গুল কফ-পিত্তবিনাশক এবং তাম্র সাধারণতঃ কফ-পিত্ত নাশক *। ফল কথা পঞ্চানন রসের সকল উপাদানই উগ্রবীর্য্যকারক, এজন্য এই ঔষধ সেবনের পর রোগী গরম বোধ করিলে টাট্কা মিছরির জল (মিছরি নেকড়ার পুঁটুলিতে বাঁধিয়া ১০।১৫ মিনিট শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিলেই তাহাকে টাট্কা মিছরির জল বলা যায়) পান করিবার ব্যবস্থা করা মন্দ নহে।

শ্লেষ্ম প্রধান জ্বরে কফকেতু নামক ঔষধটি বিশেষ ফলপ্রদ। উহার উপাদান—

টঙ্গনংমাগধী শঙ্খং বৎসনাভং সম সমম্
আর্দ্রকস্বরসে নাথ দাপয়েদ্ ভাবনা ত্রয়ম্।

অর্থাৎ সোহাগা, পিঁপুল, শঙ্খভস্ম ও বিষ * এই দ্রব্যগুলি সমভাগে মিশাইয়া আদার রসে বাটিয়া ১ রতি প্রমাণ বটি করিবে।

সোহাগার গুণ—কফঘ্ন, পিঁপুল বাতশ্লেষ্ম নাশক, বিষ ত্রিদোষ নাশক। শঙ্খভস্ম প্রধা-ণতঃ শ্লেষ্মঘ্ন। কাজেই এই ঔষধ কফপ্রধান রোগে বিশেষ কার্য্য করিয়া থাকে।

যেথানে শ্লেষ্মা লইয়া জ্বর উৎপন্ন হয়, সেখানে দিবসে ২ বার করিয়া লাল বা কাল মৃত্যুঞ্জয় এবং একবার করিয়া কফকেতুর ব্যবস্থা করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। কফকেতুর অনুপান আদার রস ও মধু।

(ক্রমশঃ

---

* তাম্রং কষায়ং মধুরং সতিক্ত
মম্লঞ্চ পাকে কটু সারকঞ্চ।
পিত্তাপহং শ্লেষ্মহরঞ্চ শীতং
তদ্রোপণং স্যাল্লঘু লেখনঞ্চ॥
পাণ্ডূদরার্শো জ্বরকুষ্ঠে কাস
শ্বাস ক্ষয়ান্ পীনসমম্লপিত্তম্।
শোথং কৃমিং শূলমপাকরোতি,
প্রাহুর্বুধা বৃংহণ মল্পমেতৎ॥

* এখন 'বৎসানভ' বিষের স্থলে 'অমৃত'ই ব্যবহৃত হয়।

* উপরত্নানি কাচশ্চ কর্পূরাশ্মা তথৈবচ।
মুক্তা শুক্তি স্তথা শঙ্খ ইত্যাদীনি বহূন্যপি॥
গুণা যথৈব রত্নানামুপরত্নেষু তে তথা।
কিন্তু কিঞ্চিৎ ততো হীনা বিশেষোঽয় মুদাহৃতঃ॥

পল্লীবাসীর আশা।

(শ্রীচণ্ডী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়:)

—:•:—

"বিরাট বিশাল আজি আশার ভাণ্ডার।
এস এস শক্তি ধর বান্ধব আমার!"

আমরা বাঙ্গলার সেই পল্লীমায়ের সন্তান—
"যেখানে রাখাল ছেলে, সহোদর মোর,
দিনান্তে শ্রমের শেষে লভে মাতৃক্রোড়।
সুমধুর স্নেহ স্বর্গে—সেই ধূলা ঢাকা,
ছায়ামাখা এক নদী—পূর্ণিমার রাকা
কৌমুদী বিলায় যেথা কুটিরের চালে,

কলকণ্ঠ মধুধারা শাখার আড়ালে,
মন কেড়ে লয় দিক্‌বধুর গুণ্ঠন,
মুকুলে আকুলি ওঠে রসাল কানন।
মেলে যেথা ছেলে মেয়ে পল্লীর খেলায়,
বকুল-বিছান-পথে গোধুলি বেলায়।
যেখানে সুখের পৌষে ভ'রিয়া উঠান—
দশদিক আলো করে সোণা ঢালা ধান।
সোণালি ধানের শিষ্ বাঁধিয়া মুঠায়
ভাই বোনে মিলে যেথা ছুটিয়া বেড়ায়।"

কিন্তু পল্লীমাতার সে উৎসব-আঙ্গিনায় ভাই বোনে আর ছুটাছুটি করে না, গোধুলির ছায়া-ধুসর দিনান্তে পল্লীর ছেলে মেয়েরা আর পল্লীর খেলায় মেলেনা। এখন পল্লী মাতার ছেলে মেয়ে গুলিকে আর পূর্ব্বের মত হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ বলিয়া বোধ হয় না। এখন মায়ের মুখেও আর সে জ্যোতিঃ নাই, মায়ের চোখেও আর সে দীপ্তি নাই। মায়ের এ যে কি মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা মায়ের সন্তানেরা কি তা বোঝে? তা'রা মাকে ভুলেছে, তাই মায়ের নিত্য হাহাকার অবারিত দীর্ঘশ্বাস, অফুরন্ত চ'খের জল! তাই কবি কাঁদিয়াছেন,—

"মা, তোমারে ভুলে গেছে সহস্র সন্তান,
চাহিয়া মা তোর মুখে কেঁদে ওঠে প্রাণ।
শৈশবে তোমার স্তনে মিছে কি শুষিয়া
নিয়েছি মা স্তন্য তোর?—উৎসঙ্গে বসিয়া—
মিছে কি মা পদার্পিনু যৌবন-আতপে?
এ বাহু, এ মুঠি গড়া তোরি ধুলা স্তূপে,
এরা কি মা তোর কাজে—তোমার সেবায়,
লাগিবেনা কোনো কালে?—বুক ফেটে যায়!"

বাস্তবিকই বঙ্গের পল্লীগ্রাম ধ্বংসের পথে চলিয়াছে! পল্লীবাসী জনগণ দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছে। যে পল্লীর সুখ-সৌন্দর্য্যই, বাঙ্গলার সুখ-সৌন্দর্য্য; যে পল্লীর শস্য-সম্পদই বাঙ্গলার ধন-সম্পদ; যে পল্লীর জ্ঞান-গৌরবই বাঙ্গলার জ্ঞানগৌরব, সেই পল্লীভূমির শ্মশান-দৃশ্য দেখিয়াও যে দেখে না, বুঝিয়াও যে বোঝে না, তা'র মত নিষ্ঠুর নির্ম্মম স্বার্থপর লোক জগতে বিরল। জগতে বিরল হইলেও এ হতভাগ্য দেশে বিরল নহে। এদেশে এখন পল্লীভূমিকে ভুলিয়া যাওয়াই যেন শিক্ষিতের পরম পুরু-ষার্থ,—শিক্ষার চরম পরিণতি! তাই বলিতে বুক ফাটিয়া যায়, পল্লী জননীর যে সন্তানটি আধুনিক বিদ্যা শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তিনিই "স্বর্গাদপি-গরীয়সী" জন্মভূমিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক নগরে চলিয়া যান। মুখে কখন বলেন, "উদরান্নের জন্যই নগরে প'ড়ে থাকি।" আবার কখন বলেন, "গাঁয়ে যে ম্যালেরিয়া, তাই আর গাঁয়ে যাই না।" কথাটা কিন্তু আসলে এই যে, পল্লীগ্রামকে বাবুদের আর মনে ধরে না। কারণ সেস্থানে আধুনিক বাবুগিরির বিবিধ উপকরণের অনেক গুলিই পাওয়া যায় না। এই সকল তথা-কথিত শিক্ষিত সুতরাং সৌভাগ্যবান বাবু-গণের আদর্শে অন্যান্য অনেকেই পল্লীমাতার স্নেহের বন্ধন ছেদন করিয়া বিলাসিতার বিবিধ আড়ম্বরপূর্ণ নগরে যাইয়া বাস করিতেছেন। এই সকল লোকের অবহেলায় গ্রামে অনেক অভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। সুতরাং পিতৃপিতামহের ভিটায় সন্ধ্যাদানের জন্য গ্রামে যাহারা পড়িয়া আছে, তাহারা উপযুক্ত ঔষধ-পথ্যের সুব্যবস্থা ব্যতীতও আরও নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করিতেছে।

গ্রামের যাঁহারা ধনাঢ্য ও শ্রীসন্তান বলিয়া বিদেশে খ্যাতি লাভ করিতেছেন, তাঁরা একটু চেষ্টা করিলে তাঁ'দের জন্মভূমি পল্লীগ্রামের আজ এ দুর্দ্দশা থাকিত কি?

যেরূপ দেশ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে পল্লীমাতার মাতৃত্যাগী পুত্রগণ ঠিক মাতৃঘাতীর মতই ব্যবহার দেখাইয়া থাকেন। বোধ হয় তাঁহাদের বিশ্বাস পল্লীমাতার সম্বন্ধ অস্বীকার করিলেই বুঝি বড় হওয়া যাইবে! তাই পল্লীমাতার বেদনা-ব্যাকুল প্রাণের কথা—পল্লীবাসীর রুগ্ন নিরন্নের দুঃখের বার্ত্তা কেহ কল্পনাতেও চিন্তা করেন না। যেন ওকথাটা মনে আনাই একটা মহা অসভ্যতা! পল্লীমাতার অনেক কৃতিপুত্র, বিদ্যা বুদ্ধিতে, ধন সম্পদে দেশেরমধ্যে গণ্যমান্য হইয়া, দেশ বিদেশের কত বড় কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া দেশহিতৈষী সাজিতেছেন, কিন্তু তাঁ'র জন্মভূমির পাড়াগাঁয়ের কথা তাঁ'র মনে জাগে না; তাই তাঁহার মুখে পল্লীগ্রামের কথা একটিবারও শ্রবণ করা যায় না! য়ুরোপের মহাযুদ্ধের বার্ত্তা, চীন-জাপানের আন্তর্জাতিক সন্ধিপত্রের নিয়মাবলী, আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের পীড়ার সংবাদ, বর্ত্তমান কালের নগরবাসী পল্লীপুত্রের নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইলেও, যে পুণ্যভূমির ধুলায় পড়িয়া, জলে নামিয়া, গাছে চড়িয়া বাল্যকালে নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করা হইত,—যে কৃষক বালকের সহিত মাঠে মাঠে ঘাটে ঘাটে ছুটাছুটি-হুটাপুটি করিয়া বন্ধুত্বের বন্ধনে চিত্ত পুলকিত হইত; কোথায় সে পুণ্য নিকেতন পল্লীভূমি, আর কোথায় সে খেলার সাথী পল্লীবাসী কৃষক বালকগণ! কে তা'দের সুখ-দুঃখ অভাব অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়া থাকেন?

চিন্তা না করিবার কারণও অনেক বিজ্ঞবিজ্ঞতাসহকারেই ব্যক্ত করিয়া থাকেন। তাঁহারা পল্লীর প্রতি অমনোযোগী হওয়ার জন্য আপনাদিগকে দোষী বিবেচনা করেন না, পল্লীগ্রাম ও পল্লীবাসিগণকেই দোষী বিবেচনা করেন এবং ইহাতেই যেন তাঁহারা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। পল্লীগ্রামের দোষ, তথায় প্রস্তরমণ্ডিত রাস্তা নাই, রাস্তার পার্শ্বে বিদ্যুতের আলোক নাই, কলের জল নাই, চপকট্‌লেটের দোকান নাই! তা'র উপর সেখানে "ম্যালেরিয়া" নামে একটা জুজুর ভয় আছে! যা'র ভয়ে বাবুরা সহরে ঘর বাঁধিয়া অমরত্বের অভিলাষী হইয়াছেন! আর পল্লীবাসী জনগণের অপরাধ, তাঁহারা এখনও পূর্ব্ব পুরুষের সংস্কার বশে মুক্তকচ্ছ হইতে পারেন নাই; তাহারা এখনও পেয়াজ-মুর্গীর মহত্ত্ব বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহারা এখনও বর্ণাশ্রম বর্জ্জন করিতে পারেন নাই; তাঁহারা এখনও অহিন্দুর সঙ্গে একসঙ্গে আহার করেন না, তাঁহারা এখনও চেয়ারে বসিয়া টেবিলে খানা খাইয়া রুমালে হাত মুছিয়া শুদ্ধিবোধ করেন না, সুতরাং তা'রা যে নিতান্তই অমানুষ এবং অসভ্য তাহাতে আর সন্দেহ হইতে পারে না। এই সকল অসভ্যদের জন্য চিন্তা করিবার উপযুক্ত অবসর কোথায়? আধুনিক শিক্ষালোকপ্রাপ্ত ও পল্লীগ্রামের সহিত সম্বন্ধ শূন্য, পল্লীমাতার এই সকল পর্ত্তজপুত্রগণই এমনি করিয়াই স্বদেশের প্রতি, স্বজাতির প্রতি ও স্বধর্ম্মের প্রতি আস্থাশূন্য হইয়া আপনাকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেছেন!

পল্লীগ্রামের পক্ষে আজ প্রকৃতই এমনই দুর্দ্দিন উপস্থিত। এই দুর্দ্দিনে "আয়ুর্ব্বেদ"

সম্পাদকের "পল্লীগ্রাম" বিষয়ক আলোচনার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। যদিও সম্পাদক আমাদের মতই পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া পল্লীগ্রামেই শিক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছেন, তথাপি তিনি কর্ম্মোপলক্ষে যখন ভারতবর্ষের প্রধানতম নগরে বাস করিয়াও পল্লীগ্রামের সুখ-দুঃখের কথা, পল্লীবাসীর অভাব অসুবিধার কথা, এখনও ভুলিতে পারেন নাই,—যখন সেই পল্লী-ভূমির উন্নতির জন্য আকুল প্রাণে আলোচনা করিতে অবসরের অভাব অনুভব করেন নাই, তখন তাঁহাকে পল্লীবাসীর পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান না করিলে পল্লীবাসী আমরা, আমাদের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করা হয় না।

আমি একটি পল্লী-ইউনিয়নের সংবাদ জানি। সেখানে গত ১৮১৮ খৃঃ অব্দে জন্ম সংখ্যা ৭২ এবং মৃত্যু সংখ্যা ১৬৪ হইয়াছিল। আর ১৯১৯ খৃঃ অব্দে জন্ম সংখ্যা ৬২ এবং মৃত্যু সংখ্যা ৯১ হইয়াছিল। এমন করিয়া প্রতি বৎসর মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকিলে পল্লীগ্রাম আর কয়দিন অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিবে? যদি পল্লীগ্রাম সমূহ এমনি করিয়াই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সহরের শ্রীসৌন্দর্য্য রক্ষা পাইবে কি? সুতরাং নগর রক্ষা করিতে হইলেই পল্লী রক্ষা করিতে হইবে। বর্ত্তমান কালে যে কোন প্রকারেই হউক পল্লীবাসী জনগণকে বাঁচাইবার ব্যবস্থা না করিলে দেশরক্ষার আর অন্য উপায় নাই। নিজে বাঁচিব বলিয়া পল্লী পরিত্যাগ করিলে, পল্লীত যাইবেই, নিজেরও বংশরক্ষার উপায় থাকিবেনা! সুতরাং নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলেই নিজের অপেক্ষা পল্লীর দিকেই অধিক নজর রাখিতে হইবে। পল্লীবাসীর সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ মনোযোগ পূর্ব্বক আলোচনা করিয়া প্রতিকারের পন্থা নির্দ্দেশ করিতে হইবে এবং কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। ইহাতেই দেশের উন্নতি, ইহাতেই সমাজের উন্নতি, ইহাতেই জাতির উন্নতি। যদি পল্লীগ্রাম গুলিকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করিতে না পার, তবে "স্বরাজ" লইয়া কাজ কি ভাই? এই শাসন সংস্কারের যুগে পল্লীবাসীর চক্ষে একটা নূতন দৃশ্য উপস্থিত হইয়াছে। যে সকল লোক পল্লীবাস পরিত্যাগ করিয়া পল্লীগ্রামকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, পল্লীবাসীকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন, আজ আবার তাঁহারাই পল্লীবাসীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। উদ্দেশ্য ভোট ভিক্ষা! লাট কাউন্সিলের মেম্বরীর আশায় পল্লীবাসীকে কত আশা ভরসার সংবাদই প্রদান করিতেছেন! অনেকে পল্লীগ্রামের উন্নতির প্রতিশ্রুতি পর্য্যন্ত প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। বাবুদের ব্যবহার দেখিয়া হাস্য সংবরণ করা যায় না। মনে হয়, দশদিন আগের ইঁহারা স্বপ্নেও পল্লীগ্রামের কথা চিন্তা করিতেন না, ভ্রমেও পল্লীবাসীর কথা ভাবিতে পারিতেন না। তখন ইঁহারা ছিলেন সভ্য, আর পল্লীবাসী ছিল অসভ্য! পল্লীগ্রামগুলি ছিল অসভ্যতার আকর! এখন কাজের খাতিরে বাবুরা সে পার্থক্য ভুলিয়া গিয়াছেন! দেখা যা'ক, "স্বরাজ" পাইয়া পল্লীগ্রামের শ্রীপরিবর্ত্তন হয় কি না!

পল্লীবাসীরও এবার একটা খুব বড় দায়িত্ব তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। চক্ষু লজ্জার খাতিরে বা উপরোধে অনুরোধে

পড়িয়া থা'কে তাকে যেন ভোট দেওয়া না হয়, যে ব্যক্তি যথার্থই পল্লীগ্রামের হিতৈষী, যথার্থই পল্লীবাসীর ব্যথায় ব্যথী, যিনি উচ্চ-শিক্ষালাভ করিয়া নগর বাসের সুবিধা পাইয়াও কোনদিনও পল্লীভূমিকে ভুলেন নাই, যিনি সুবিধা ও সুযোগ পাইলেই কোন না কোন উপায়ে পল্লীভূমির সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছেন, এমন শিক্ষিত, স্বাধীন চেতা ও উদার প্রকৃতির উপযুক্ত ব্যক্তিকেই যেন নিজেদের প্রতিনিধি মনোনীত করা হয়। অনেক জমিদার এখন ভোটের জন্য প্রজার দ্বারস্থ হইয়াছেন। কেন তাঁহাদের এ নির্লজ্জ ব্যবহার তাহা বুঝিতে পারি না! কেন না তাঁহারাই চেষ্টা করিয়া জমিদার শ্রেণীর জন্য পৃথক আসন স্থির করিয়া লইয়াছেন। এখন আবার প্রজার দ্বারে কেন? প্রজা প্রজাকেই চায়, রাজাকে চায় না। যে জমিদার নিজের জমিদারীতে এতটুকু সুবিধা দিতেও কুণ্ঠিত, সে জমিদার প্রজার প্রতিনিধি হইলে, প্রজার কতটুকু উপকার হইবে, তাহা কে বলিতে পারে। ঠিক এইরূপ ঘটনাতেই প্রাচীন কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন,—

"হ'লে ভক্ষকেতে রক্ষাকর্ত্তা ঘটে সর্ব্বনাশ।
কালসাপ কি কোন কালে, দয়াতে ভেকে পালে
টপাটপ অমনি করে গ্রাস!"

সাবধান পল্লীবাসী জনসাধারণ! এবার তোমাদের সম্মুখে কঠোর অগ্নি পরীক্ষা। যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পার, বাঙ্গালার পল্লীগ্রাম আবার হয়ত পূর্ব্ব স্বাস্থ্য সম্পদ ফিরিয়া পাইতেও পারে, কিন্তু যদি স্বার্থপর মায়াবীর কুহকে পতিত হও, তাহা হইলে নিশ্চয় জানি ও "তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে!"

উপসংহারে নিবেদন, পল্লীরক্ষার জন্য বচন বিন্যাস অনেক হইয়া গিয়াছে, এখন কাজের সময় আসিয়াছে। আমরা পল্লীগ্রামে পড়িয়া আছি, অনেক কথাও শুনিয়াছি, অনেক আশাও পাইয়াছি; কিন্তু কর্ম্মীর সাক্ষাৎ পাই নাই। এখনও সেই কর্ম্মীর আশা পথ চাহিয়া আছি। "আয়ুর্ব্বেদ" সম্পাদকের বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া আমরা অহর্নিশি আহ্বান করিতেছি,—"কে আছ মহাপ্রাণ বাঙ্গলার গৌরব! এস ভাই" বাঙ্গলার পল্লীগ্রাম গুলিকে রক্ষা করিয়া বাঙ্গালীকে রক্ষা কর।" "মনে রেখো ভাই,—

"কথায় হ'বেনা কিছু বৃথা আস্ফালন,
ধ্বনিয়া তুলিতে হ'বে প্রাণের স্পন্দন।"

ম্যালেরিয়া ও তাহার প্রতিকার।

(শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র পাল)
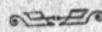
যে সর্ব্বনাশী মূর্ত্তিমতী রাক্ষসী আজ বাঙ্গালার প্রতি গৃহে আপনার করাল কবল বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে এবং প্রতিদিন মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দনের রোল উঠাই-

তেছে—যাহার বিষাক্ত নিঃশ্বাসে এমন সোণার বাঙ্গালা শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে—ধনজনে পরিপূর্ণ গ্রাম নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইতেছে—বালক-বালিকার সুমধুর কলরবে মুখরিত সংসার নীরবে পর-পারের যন্ত্রী হইয়া অনুক্ষণ অপেক্ষা করিতেছে এবং যাহার কৃপায় আজ বঙ্গজননীদের লোচনযুগল উত্তপ্ত উৎসের আলয় হইয়াছে—তাহার কথা আজ কিছু বলিব। কে সে? সে রাক্ষসী ম্যালেরিয়া।

ম্যালেরিয়া—সংক্রামক ব্যাধি। অতি ক্ষুদ্র একপ্রকার কীট হইতে ইহার উৎপত্তি এবং সেই কীট একপ্রকার মশকের (Anophelinse) দ্বারা মানবদেহে নীত হয়। প্রথমে এই মশক কোন ব্যাধিগ্রস্ত প্রাণীকে কামড়াইয়া নিজে সংক্রামিত হইয়া মানুষকে দংশন করিয়া সংক্রামিত করে। এই ব্যাধিকে একেবারে নির্ম্মূল করিবার কোন উপায় বা ঔষধ উদ্ভাবিত না হইলেও ইহাকে বাধা দিবার জন্য কতক উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আজ পর্য্যন্ত ইহার সম্বন্ধে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছি যে, পৃথিবীর সমমণ্ডল অপেক্ষা গ্রীষ্মমণ্ডলেই ইহার প্রকোপ অধিক। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এসিয়াতে যত বেশী, ইউরোপে তত নয়। ভারতবর্ষে, চীনদেশে, ব্রহ্মদেশে, সিংহলে, মালয়, উপদ্বীপ প্রভৃতিতে ইহার বাসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। কিন্তু উপরি উক্ত দেশের তুলনায় দক্ষিণ বাঙ্গালায় ইহার প্রবল প্রতাপ। আবার আফ্রিকার পশ্চিম খণ্ডে ইহার প্রকোপ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

এখন কথা হইতেছে এই ভয়ঙ্কর ব্যাধি হইতে মুক্তি পাওয়া যায় কি না? ইহা হইতে একেবারে মুক্তি পাওয়া যায় কি না তাহা বলা বড় কঠিন কথা * তবে ইহাও দেখিতে পাওয়া যে, কোন কোন ঘটনায় একবার আক্রমণের পর আর আক্রমণ করে না—আবার পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতেও দেখা যায়। কিন্তু অধিক আক্রমণ ও পুনঃ পুনঃ আক্রমণের পর অবশিষ্ট জীবনে আর তত কষ্ট পাইতে হয় না, শরীর একপ্রকার 'ম্যালেরিয়া প্রুফ' হইয়া যায়। আবার ইহাও সচরাচর দেখিতে পাই ম্যালেরিয়া পীড়িত জেলায় বৃদ্ধেরা বেশ সুস্বাস্থ্য ভোগ করেন এবং এই ব্যাধি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। চীনা, মালয় দেশবাসী, নিগ্রো বাল্যাবস্থায় ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া পরবর্ত্তী জীবনে সুস্বাস্থ্য ভোগ করে। তাই সে সকল দেশে মৃত্যুর সংখ্যা বালকদের ভিতর যত অধিক বয়স্কদের ভিতর তত থাকে না।

ম্যালেরিয়া সাময়িক ব্যাধি। ইহা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ঋতুতে প্রকাশ হয়। সেই সময়ে ম্যালেরিয়ার জীবাণুবাহী মশকের জন্ম হয়। গ্রীষ্মকালই মশক উদ্ভবের প্রশস্ত সময়। পৃথিবীর সমমণ্ডলে গ্রীষ্মকালেই ইহার প্রকোপ। ভারতবর্ষে ম্যালেরিয়া আষাঢ় মাস হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত

* মুক্তি পাওয়া যায় বই কি,—তবে দেশের লোকের সে মুক্তিলাভের আগ্রহ চাই। আমরা আগামীবারে "ম্যালেরিয়া" শীর্ষক প্রবন্ধে অন্যান্য দেশের লোক ম্যালেরিয়ার হাত হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ করিয়াছিল, সে সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।—আঃ সং

প্রবল প্রতাপে আধিপত্য করিয়া থাকে। আশ্বিন মাসে শারদীয় পূজার সময় অনেক মাতার কোল শূন্য করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ের ধনকে জন্মের মত এই জগৎ হইতে অন্য জগতে রাখিয়া আসে। বোধ করি, এখানে কষ্ট পাইতেছিল বলিয়া ম্যালেরিয়াহীন জগতে রাখিয়া আসে। এই ব্যাধি গ্রামজ। সহরে ম্যালেরিয়া প্রায় দেখা যায় না—যেমন কলিকাতা। তাহার কারণ সহরে যেমন পয়ঃপ্রণালী আছে, গ্রামে তেমন নাই, গ্রামে জল নির্গত হইতে না পারিয়া গর্ত্ত-পগারে জমিয়া থাকে পল্লীগ্রামে মশকদিগের বহুল-পরিমাণে উৎপত্তিও সেইজন্য। সুতরাং যে স্থান শিথিল, বালুকাময়, স্যাতসেঁতে এবং যেখানে জলাভূমি, খাল, পুকুর, ডোবা, জলভরা নয়ানজুলী, ধানের ক্ষেত্র প্রভৃতি থাকে, সেই সকল স্থানেই মশকের বংশবিস্তৃতি লাভ করে। পাটের চাষ ম্যালেরিয়ার প্রধান সহায়, কারণ পাট গাছ না পচাইলে পাট পাওয়া যায় না। তাই চাষারা বদ্ধ-জলের ডোবায় পাট পচা-ইতে দেয়, ইহাতে মশক-সৃষ্টি খুব দ্রুত চলে। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, যে সকল স্থানে পূর্ব্বে রেল হয় নাই, তাহা ম্যালেরিয়া পীড়িত ছিল না, কিন্তু রেল হইবার পর সে সমুদয় দেশ এই ব্যাধিতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় রেলও এই ব্যাধির একটী কারণ। রেলের জন্য বড় বড় গর্ত্তে জলে জমা থাকে ; সেই সকল আবদ্ধ-জলে মশকের জন্ম হয়, আর রেলের রাস্তা করিবার জন্য অনেক বাঁধ দিতে হয় তাহাতে জল নির্গমনের স্বাভাবিক পথ বন্ধ হইয়া যায়। আর অতিশয় পরিশ্রম খাদ্যাভাব, অন্ধকারময় স্থানে কাজ করা, অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস প্রভৃতি ম্যালেরিয়ার অনুকূল।

ম্যালেরিয়া বীজ বা পোকা সাধারণ কথায় পরগাছা অর্থাৎ পরেরউপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করে। এই পোকাদের স্বতন্ত্র ভাবে বাঁচিবার উপায় নাই, অন্য প্রাণীর শরীরের ভিতর প্রবেশ করিয়া, তাহারই শরীরে আহার সংগ্রহ করিয়া আপনাদিগকে পরিপুষ্ট করে এবং ইহারা এত অধিক পরিমাণে সংখ্যায় বৃদ্ধি হয় যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সর্ব্বশরীরে বিস্তৃত হয়।

এই এনোফেলিন মশক দংশন হইতে আত্মরক্ষা করিবার সুতরাং ম্যালেরিয়া হইতে অব্যাহতি পাইবার বহুবিধ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলি বহু অর্থ সাপেক্ষ, সুতরাং এমন গরীব দেশে সে সকল ব্যবহার করা আকাশ কুসুম ছাড়া আর কিছুই নয়। তাহাদের মধ্যে একটী হইতেছে "মশক-প্রুফ বাড়ী" অর্থাৎ সমস্ত বাড়ী খুব সরু তারের জাবড়ি দিয়া আঁটা থাকে। আমেরিকায় এরূপ ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে ইহা স্বপ্ন মাত্র। তবে কি ইহা অপেক্ষা আর কোন উপায় নাই—যাহার দ্বারা এই গরীব দেশের গরীব অধিবাসী ম্যালেরিয়া হইতে রক্ষা পায়? আছে। মশারি,—আমাদের দেশের সকলেই জানেন আর তাহার প্রচলন ও বড় কম নয়। ইহার প্রচলনও এই মশার জন্যই হইয়াছে। আর নামটীও তদুপযুক্ত। কিন্তু এখন যে পরিমাণে মশারির ব্যবহার আছে আমাদের দেশে তাহা অপেক্ষা আরও অধিক পরিমাণে ইহার ব্যবহার করিলে ম্যালেরিয়া অনেক কম হয়। আমি দেখেছি পল্লীগ্রামে সঙ্গতি থাকিতেও অনেকে মশারি ব্যবহার

করেন না। তাঁহারা ভাবেন এটা একটী বাবুগিরীর বিষয় ও বিলাসিতার উপকরণ। কিন্তু তাঁহারা এমনি অন্ধ যে, এই সামান্য খরচ বাঁচাইতে গিয়া ম্যালেরিয়ার হস্তে পড়িয়া অনেক খরচ করিয়া ফেলেন। শুধু কি টাকা খরচ করিয়া নিস্তার পান।—শরীরটী একেবারে জীর্ণ করিয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া পড়েন। মশারি ব্যবহারে সংক্রামক মশা কামড়াইতে পারে না, সুতরাং নিজেরা ত রক্ষা পান, উপরন্তু অপরকেও রক্ষা করিতে পারেন, কারণ এই সংক্রামক ব্যাধি অপর শরীরে প্রবেশাধিকার পায় না। দুঃখের বিষয় অনেকে এসম্বন্ধে বড়ই উদাসীন। তারপর * ইলেক্‌ট্রিক পাখা, টানা পাখা, হাত পাখা মশক বিতাড়নের উপায়। ফাঁকা যায়গায় যেখানে বাতাসের চলাচল বেশ আছে সেখানে বাস করা অতীব প্রয়োজন, কারণ বায়ু তাড়নে মশা তিষ্ঠিতে পারে না। রাত্রে নিদ্রার সময় গায়ে কাপড় দিয়া শয়ন করা উচিত। পাতলা কাপড়ে উদ্দেশ্য সাধিত হয় না, মোটা পশমের কাপড়ই প্রশস্ত। অন্ততঃ এই ম্যালেরিয়ার সময়টা এরূপ ভাবে চলিলে লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই। সাধারণতঃ শরীরে অপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা পা দুইটাই উন্মুক্ত থাকে, ইহা ঠিক ব্যবস্থা নয়, কারণ ইহাতে মশকেরা পায়ে ও মুখে কামড়াইবার সুবিধা পায় কাজেই এই উভয় অঙ্গই বেশ আবৃত করিয়া শয়ন করা যুক্তি সঙ্গত। মশারি শুভ্র কি পীতবর্ণ হওয়া আবশ্যক কারণ অন্যান্য রঙের মশারি হইলে মশকের শুভাগমন অধিক মাত্রায় হইয়া থাকে।

নানাপ্রকার গ্যাসের দ্বারা মশকের উচ্ছেদ সাধিত হয়। গন্ধকের ধুম এবং নিমপাতার ধুম মশক-প্রতিষেধক। মেন্থল, কর্পূর, তার্পিণ প্রভৃতিতে মশক মরিয়া যায়। ইউকালিপটাস্ তৈল, নেবুর তৈল যে সকল প্রত্যঙ্গ অনাবৃত থাকে তাহাতে মাখিয়া শয়ন করিলে মশক দংশন হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

মশক দূরীকরণের এই সকল উপায় চিরস্থায়ী নয়। ড্রেণ পদ্ধতি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। কাঁচা ড্রেণ অপেক্ষা পাকা ড্রেণই ভাল, কারণ তাহাতে জল জমিতে পায় না। আর কাঁচা ড্রেনে জল জমিয়া মশার সৃষ্টি করিয়া থাকে। বর্ষাকালে খাল, ডোবা, পচা পুষ্করিণী, নয়নজলী প্রভৃতির জল ড্রেণ কাটিয়া বাহির করিয়া দেওয়া উচিত। ঐ সকল জলাশয়ে কেরোসিন তৈল, পেট্রোলিয়ম (Petroliom) পেসটারিণ (pesterine) ছড়াইয়া দেওয়া উচিত। পানামা, কাইরো প্রভৃতি দেশে যেখানে ম্যালেরিয়ার অতিশয় প্রকোপ সেখানে সমান অংশে কেরোসিন ও (pesterine) পেষ্টারিণ মিশ্রিত করিয়া বদ্ধ জলে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। ব্যাঙ, ছোট ছোট মাছ, টিক্‌টিকী, গিরগিটী, শামুক প্রভৃতি প্রাণী মশকের শত্রু। অবশ্য এ সব প্রাণী আর আমাদের হাত ধরা নয়। ভগবান যেমন মশকের সৃষ্টি করিয়াছেন তৎসঙ্গে অমনি তাহাদের পরম শত্রুরও সৃষ্টি করিয়াছেন জগতের এই সামঞ্জস্য ভাব দেখিলে অমনি ভগবানের কথা মনে পড়িয়া যায়। আর কৃতজ্ঞতায় প্রাণ ভরিয়া উঠে, শির নত হইয়া যায়।

* পল্লীগ্রামে ইলেক্‌ট্রিক পাখার প্রচলন সম্ভবপর নহে। ব্যজনী তাড়নে মশকদিগকে তাড়াইয়া আত্মরক্ষার উপায় করা অপেক্ষা গ্রামের বনজঙ্গলগুলি কাটাইয়া, কর্দ্দম-পঙ্কিল ডোবা-গর্ত্তগুলি বুজাইয়া ম্যালেরিয়ার হাত হইতে অব্যাহিতি লাভের চেষ্টা করাই প্রশস্ত। আঃ সং

কলিকাতা, ২০৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ গোবর্দ্ধন প্রেসে এবং
২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট হইতে
কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মাসিকপত্র ও সমালোচক

৫ম বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৭—কার্ত্তিক। | ২য় সংখ্যা।

শ্রীদুর্গা স্তোত্রামৃতং।

(কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কাব্যতীর্থ কবিভূষণ)

মাতঃ ক্বাসি ত্বমন্থ ত্রিনয়নি জগতামেককর্ত্রী ভবত্যাঃ
প্রীতিক্ষেত্রং ধরিত্রীস্থরপুরমতুলং ভারতং পশ্যদুঃস্থং।
দৈত্যৈ দারিদ্র্যরূপৈ দ'লিতমনুদিনং ব্যাধিরক্ষঃপ্রতাপ-
ধ্বস্তপ্রায়ং হতাশং মৃতসদনমিবাদ্যাপি রক্ষপ্রসন্না ॥ ১ ॥

নিত্যানন্দময়ীশিবে ত্বমসিভোঃ সর্ব্বার্থ সিদ্ধিপ্রদা
রুষ্টাকিংবরদেহসিভারতসুতে সদ্ধর্ম্মবর্ত্ম্যুচ্যুতে।
কিম্বা কর্ম্মফলস্তদুর্বিলসিতং তন্নেতি বিজ্ঞায়তে
যত্ত্বং ক্ষান্তিময়ী ত্রিলোক শুভদা কর্ম্মাব্ধিবিনিস্তারিণী ॥ ২ ॥

ত্বং কালিকা কালবিধানকর্ত্রী
দুর্গাসি দৌর্গত্যবিনাশয়িত্রী।
ত্বমীশ্বরী সর্ব্ব সুখাদিদাত্রী
ত্বং শঙ্করী বিশ্ববিপন্নিহন্ত্রী ॥৩॥

স্বগৌরবেণাবৃতসর্ব্বলোকা
স্বয়ং সদারক্ষসি বিশ্বমীড্যে।
সংহার-মূর্ত্ত্যা স্বয়মেব হংসি
জানাতি তত্ত্বং তবকো যথার্থং ॥৪॥

ত্বমস্য পাপে সুকৃতে-২থ সর্ব্বদা
সংসারিণাং বিভ্রম-সাক্ষিণী শিবে!
ন কর্ত্তৃতা কাচন কিন্তু কারিণাং
ক্রিয়াস্বহোতে মহিমাদুরত্যয়ঃ ॥৫॥

জ্ঞান কর্ম্মপরিযোগয়োর্বহিঃ
সংস্থিতাসি সকলার্থ সাধিনী।
শক্তিরস্য কথমস্মি সংসহ
ত্বৎ স্বরূপমবলম্বিতুংশিবে ॥৬॥

দুর্গে কোঽহম-পাস্তশক্তিরধমস্ত্বদ্ভক্তিশক্তিচ্যুতো
দুঃসঙ্কল্পমলাবৃতিপ্রতিহতস্বান্তচ্ছবি দুর্ম্মতিঃ।
কোবা সংসৃতিসিন্ধুরেষ সুমহান্ দুষ্পার আস্থৈরপি
কিম্বামাং ননুকিংপরীক্ষস ইহ ক্রীড়েব সা দর্শিতা ॥ ৭ ॥
মাতা মে মমতাময়ী ত্রিজগতা মেকেশ্বরীশঙ্করী
দীনোঽহং বসনাশনার্জ্জনধনে ঽপ্যস্তাধিকারঃসুতঃ।
তদ্ ভোমানস মানশঃ কলুষকৃচ্চিন্তাবিষৈরাহতং
ভুয়া যোগ্য মযোগ্যসন্ততি-বশং কা কাঙ্ক্ষতিস্বংপ্রসূঃ ॥ ৮ ॥
মাতাত্বং ভুবনেশ্বরী সচপিতা ত্রৈলোক্যনাথঃশিবঃ
ইত্থংখ্যাতকুলান্বয়োঽপ্যনুদিনং বর্ত্তেঽত্রযদ্দুঃখভাক্।
তৎকিংত্বং সুতবৎসলত্বরহিতা কিম্বা সুতোঽহং নতে
দৌঃশীল্যেন বিবর্জ্জিতোঽস্ম্যথ শিবে কামাতৃতাতৎতব ॥ ৯ ॥
ক্লেশং দত্ত্বা চরণশরণান্ হন্তুকামাসি হন্ত
জ্ঞাতং দুর্গে তবসুচরিতং যাদৃশং সর্ব্বথামে।
তন্নাহং তত্ভয়পরিগতঃ পাদপদ্মং জহামি
ত্বদ্বৎ তন্নোজগতি বিদিতং ত্রায়কং সেবকানাং ॥ ১০ ॥
মুক্তিং বা বন্ধনং মাতরিচ্ছয়াতে লভেত না।
ন তন্ডীতোঽস্মি যদ্দুর্গেত্বংদীনদুঃখহারিণী ॥ ১১ ॥
দুর্গাদুর্গেতি কথনপরঃ সত্ত্বআপ্তপ্রভাবাৎ
পাপান্মুক্তোঽনুভবতিফলং জন্মনঃসিদ্ধিরূপং।
আয়ুর্ব্বেদ স্তদয়মধুনা পঞ্চমাব্দোপনীতঃ
সাফল্যং স্বংজনহিতময়ং যাতুদুর্গেচিরায় ॥ ১২ ॥

ম্যালেরিয়া।*

আমার নাম ম্যালেরিয়া। বাঙ্গালাদেশে এখন আমার একাধিপত্য, আমার প্রভাবে বাঙ্গালার পল্লী-গ্রামের হাজারকরা ত্রিশজন কৃষক ভবযন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। শুধু বাঙ্গালাদেশ কেন, এখন ভারতের নানা স্থানেই আমার আধিপত্য সারা বছরটাই প্রায় সমানভাবে চলিতেছে। আমার জন্য কত 'আনাড়ীর' অন্ন সংস্থানের উপায় হইয়াছে, রাশি রাশি 'কুইনাইনে'র ফাইল বিক্রয় হইতেছে,—অনেক পেটেণ্টওয়ালার অর্থের সংস্থান আমারই জন্য। ডাক্তারেরা তো আমায় দমন করিবার জন্য 'কুইনাইনের' ব্যবস্থা করিয়া থাকেনই, তা'ছাড়া অনেক কবিরাজ মহাশয়ও এখন আর আমাকে দমন করিতে না পারিয়া ঐ কুইনাইনেরই সহিত একটু রসসিন্দুর মিশাইয়া রঙ্গের বিকৃতিপূর্ব্বক ব্যবসায়ের পন্থা পরিষ্কার করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। লেখকেরা আমার অভিধান দিয়া থাকেন—'রাক্ষসী'। কেহ কেহ আমাকে 'দানবী' নামেও অভিহিতা করেন। সে কথা কতদূর সত্য তাহা সাধারণে বিচার করিবেন, কিন্তু এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, যদি আমি ভারতবর্ষে শুভাগমন না করিতাম, তাহা হইলে দেশে এত চিকিৎসকের সংখ্যাও বাড়িত না, কাজেই অনেককে উদরান্নের সংস্থানের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত।

কবিরাজ মহাশয়েরা বলেন, ভারতবর্ষে এখন আমার প্রভাবটা খুব বেশী ভাবে দেখা দিলেও আগেও নাকি তাঁহারা আমাকে অন্য মূর্ত্তিতে দেখিতে পাইতেন,—সে মূর্ত্তির নাম ছিল বিষমজ্বর। হইতে পারে তাঁহাদের কথা সত্য, কিন্তু তখন আমার প্রভাবটা এত ছিল না, কাজেই আমার প্রকট মূর্ত্তির পরিচয় এ দেশের লোকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। ইংরাজ রাজত্বের সৃষ্টির কিছুকাল পরে, ১৮০৪ খৃঃ অব্দে মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজারে আমি সর্ব্ব প্রথমে একবার দেখা দিই, কিন্তু তখনও লোকে আমাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারে নাই। তাহার আরও বিশ বৎসর পরে ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা সীতারাম রায় প্রতিষ্ঠিত যশোহরের মহম্মদপুরে আবির্ভূত হইয়া সেই বৎসরই ৪।৫ হাজার লোকের ভবযন্ত্রণা আমি মুক্ত করিয়া দিই। তাহার পর যশোহরের চিত্রা-নদীর দুইধার দিয়া কত গ্রাম—কত জনপদ যে আমি ধ্বংস করিয়াছি তাহার আর ইয়ত্তা নাই। নলডাঙ্গা—যশোহর জেলার একখানি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল, গদাখালি ঐ জেলার একটি বড় রকমের বাণিজ্যবহুল বন্দর ছিল—আমার প্রভাবে সেই দুই স্থানের যে কত লোক মুক্তিলাভ করিয়াছে তাহার আর সংখ্যা নাই। ইংরাজেরা আনুমানিক হিসাব করিয়াছেন, এক গদাখালিতেই সে বার

* গত ৯ই ভাদ্র "আয়ুর্ব্বেদ সভার" ১০ম বার্ষিক ১ম অধিবেশনে পঠিত।

লোক মরিয়াছিল ৬া৭ হাজার, হইতে পারে তাঁহাদের অনুমান সত্য, কিন্তু অনেক সময়ই হিসাবের তারতম্য নানা কারণে যেরূপ ঘটিয়া থাকে—এক্ষেত্রেও যে সেরূপ ঘটে নাই তাহাই বা কে বলিতে পারে ? আসল কথা, কাশীম-বাজারের পর আমাকে প্রথমে চিনিতে পারে যশোহরের মহম্মদপুর, তা'র পর নলডাঙ্গা ও গদাখালির অধিবাসিগণ।

ইহার পর বীরনগর বা উলার লোকে আমাকে ভাল করিয়াই চিনিল। বীরনগর বা উলা নদীয়া জেলার খুবই সমৃদ্ধিসম্পন্ন গ্রাম ছিল। একবার দেখা দিয়াই সে বৎসর আমি ঐ গ্রামের ৯০০০ হাজার লোককে ভবযন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি দিয়াছিলাম। উলায় সেবার এমন মজা হইয়াছিল যে, হয় তো কোনো একটি বাড়ীর সমস্ত লোককেই আমি গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছি, সন্ধ্যা জ্বালিবার লোক পর্য্যন্ত বাড়ীতে কেহ নাই, এমন অবস্থায় একদিন রাত্রে সেই বাড়ীর জামাতা আসিয়া দরজায় ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিলেন। তাঁহার চীৎকারের ফলে আপনা আপনি দ্বার খুলিয়া গেল, জামতা বাটীর মধ্যে মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পত্নী সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, বলিলেন, "বাড়ীতে কেহ নাই, সকলে কুটুম্বিতা রক্ষার জন্য অন্যত্র গিয়াছে, আমার শরীর অসুস্থ, ঐ জল আছে পদদ্বয় ধৌত কর, ভোজ্যদ্রব্য ঐ ঘরে আছে, নিজেই লইয়া আহার কর।" স্বামী তাহাই করিলেন, কিন্তু আহারকালে একটু লবণ চাহিয়া বসিলেন। স্ত্রী সেই লবণ প্রদানের জন্য দশ হাত দূরে থাকিয়াই যোজনপরিমিত হস্ত বিস্তার করিলেন, দেখিয়া স্বামীর অন্তরাত্মা ছাড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে দৌড়িয়া বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িলেন, হাঁপাইতে হাঁপাইতে আর এক বাড়ীর অধিকারী নিকট গিয়া শুনিলেন, সে বাড়ীর যাবৎ অধিবাসীই আমার আক্রমণে কিছুদিন পূর্ব্বে অনিত্য দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সে বাড়ী এখন প্রেত-দানবের লীলাভূমি হইয়াছে।

শুধু উলা বা বীরনগরেই নহে, সেই বৎসরই নদীয়ার কাঁচরাপাড়া এবং চাকদহেও আমার প্রভাব এইরূপই বাড়িয়াছিল। কাঁচরাপাড়ায় তখন লোক সংখ্যা ছিল ৩০০০ জন, আমার আক্রমণে উহার মধ্যে ১০৫৫ জন ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছিল।

এ সকল ঘটনা ঘটিতেছিল ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে। নৈহাটী ও হালিসহরের সর্ব্বনাশও আমি এই বৎসরই ঘটাইয়াছিলাম। তাহার পর ১৮৬১ খৃঃ অব্দে হুগলী জেলার ত্রিবেণী আক্রমণ করিয়া দ্বারবাসিনী হইয়া আমি বারাসতে উপস্থিত হই। আমার সে উপস্থিতির ফলে সেখানকার এমন অবস্থা ঘটিল যে, অনেক বাড়ীতে মুখে জল দিবার পর্য্যন্ত লোক রহিল না, সকলেই আমার তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত, কে কাহাকে দেখে, কে কাহার শুশ্রূষা করে ? ক্রমে এমন অবস্থা ঘটিল যে, অনেকের মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার লোক পর্য্যন্ত মিলিল না, শকুনি, গৃধিনী, শিবাকুল দিবাভাগেই সে সকল গ্রামে তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিল।

ইহার তিন বৎসর পরে ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে কাটোয়ায় গিয়া আমি উপস্থিত হই। সেখান

হইতে মেহেরপুর ও পুনরায় দ্বারবাসিনী হইয়া গোবরডাঙ্গার অধিবাসীদিগকে আমার আগমন বুঝাইয়া দিই।

তাহার তিন বৎসর পরে বিদ্যা-সুন্দরের লীলাভূমি বর্দ্ধমান জয়ের জন্য আমি প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি আমার সাঙ্গপাঙ্গগুলিকে লইয়া সেখানে গমন করি এবং আমার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ সে জেলার সকল অধিবাসীকেই ভাল করিয়া চিনাইয়া দিই। এইরূপে বাঙ্গালার সকল জেলার লোকেই আমাকে ক্রমশঃ চিনিতে পারে।

শুধু বাঙ্গালাদেশ কেন, ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে গাজীপুর জেলাতেও আমার আক্রমণ কম ছিল না, সে আক্রমণে আমি যেরূপ ভাবে গাজীপুর ধ্বংস করিয়াছিলাম—তাহাও মহামারী নামে পরিগণিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষ জয় করিবার পূর্ব্বে আমি পৃথিবীর অনেক মহাদেশের অধিবাসিগণের সহিতই সমরায়োজন করিয়াছিলাম, আফ্রিকার প্রায় সকল স্থান, দক্ষিণ আমেরিকায় পেরু ও ব্রেজীল প্রদেশ, যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ প্রদেশ সমূহ, ইউরোপের অনেক স্থান, সকলের চেয়ে ইটালীর 'ক্যামপানা' ও 'পন্টাইন' প্রভৃতি স্থানগুলিতে আমার আক্রমণ খুব জমকাইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে সকল দেশের অধিবাসিগণ নানারূপ তোড়জোড় লইয়া আমার সহিত যুদ্ধে আমাকে পরাস্ত করিয়াছে, ভারতবর্ষের লোকদের বুদ্ধি থাকিলেও তাহারা বচনসর্ব্বস্ব, কাজেই আমার এস্থানের জয়টার বর্ষ গণনা ১১৬ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে।

এখন ভারতবর্ষের তাবৎ প্রদেশেই আমার প্রভাব অপ্রতিহত। বাঙ্গালার পল্লীগুলিকে তো আমি ছাড়খাড়ে দিয়াছিই, বিহার-প্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, বম্বে, মাদ্রাজ—ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই এখন আমি কোথাও শান্ত মূর্ত্তিতে—কোথাও বা বাঙ্গালার মত প্রচণ্ড মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছি। ১৯০০ হইতে ১৯০৪এর ভিতর আমার আক্রমণে ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ প্রদেশে হাজার করা কত জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদান করিলাম,—

প্রেসিডেন্সি বিভাগ	২৪'৮
বর্দ্ধমান	২০.৫
পাটনা	২১'৫
ভাগলপুর	২৩'১
উড়িষ্যা	১২'৯
ছোটনাগপুর	১৬'৭

প্রেসিডেন্সী বিভাগের আবার বিভিন্ন জেলা গুলিতে কিরূপ লোকক্ষয় করিয়া দিলাম তাহার পরিচয় লউন,—

যশোহর	৩২'৪
নদীয়া	৩৩'৩
মুর্শিদাবাদ	২৯'৬
খুলনা	২০'৪
২৪ পরগণা	১৮'৩

১৯০৬ খৃঃ অব্দে সর্ব্ব রকমে মানুষ মরিয়াছিল ৩৪'৬৬, তাহার মধ্যে আমার আক্রমণে মরিয়াছিল ২২'৯৮। ঐ খৃঃ অব্দে বাঙ্গলা দেশে সমস্ত রোগে মানুষ মরিয়াছিল ৩৪'৭৮, তাহার মধ্যে আমি মৃত্যুর পথ পরিকার করিয়া দিয়াছিলাম ১৪'৩১ জনের।

আমার আক্রমণে বাঙ্গালা দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও কমিয়া গিয়াছে। কিরূপ

কমিয়াছে দেখিবেন? ১৮৭২—৮১ খৃঃ অব্দে শতকরা ১১.৪ জন বৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্তু ১৮৮১—৯১ সালে ৭.৩ এবং ১৮৯১—০১ সালে শতকরা ২.৪ জনের বেশী লোক বাড়ে নাই। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় আমার প্রকোপ কিছু কম, এজন্য সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিছু বেশী। ইংলণ্ডের তুলনায় বাঙ্গালায় জন সংখ্যা বৃদ্ধির হার এখন অর্দ্ধেক মাত্র, কিন্তু ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে জন সংখ্যা বৃদ্ধির হার ইংলণ্ডের দ্বিগুণ ছিল। আমার প্রতাপে বাঙ্গালা দেশে জন সংখ্যা বৃদ্ধির হার ইংলণ্ডের অর্দ্ধেক দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বাঙ্গালার যেখানে মাইল প্রতি ৪২—৪৭ জনের জন্ম হয়, ইংলণ্ডে সেখানে ২৭ জনের বেশী হয় না।

এইবার আমি মানব শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া কিরূপভাবে তাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকি সেই কথাটা বলিব। আমার জীবাণু সকল মানব শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমেই রক্তকে পাইয়া বসে। আমার জীবাণুগণ রক্ত কণিকার অম্লজানবাহী সার অংশ গ্রহণ করিয়া এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ মসীকা প্রস্তুত করে, কাজেই তাহার ফলে মানব শরীরের রক্তকণিকা কমিয়া গিয়া রক্তাল্পতা ঘটে, মানব শরীর ধ্বংস করিবার পক্ষে এই জন্যই আমার সহজে সুবিধার পথ পরিষ্কৃত হয়।

আমার দুইটি প্রধান অনুচরের উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি তাহাদের নাম যকৃৎ ও প্লীহা, আমি প্রবলভাবে আক্রমণ করিলে এ দু'টি অনুচরের অন্ততঃ একটীও আসিয়া জুটিবেই জুটিবে। ঐ দুইটি অনুচর আমার সহিত জুটিয়া থাকে—শব্দের অর্থ মানব শরীরে তাহারা ত বিদ্যমান আছেই, আমার আক্রমণে তাহারা বৃদ্ধিভাবে দেখা দিয়া তাহাতে কাল রং টানিয়া আনে। রক্তাল্পতার জন্য পূর্ব্বে যে মসীকার কথা বলিয়াছি—সেই মসীকা রক্তস্রোতে ভাসিয়া শরীরের সকল স্থলে উপনীত হয় এবং তাহাদিগকে কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করে। আমার আক্রমণ যত বেশী পুরাতন হইতে থাকে—ঐ মসীকার আবির্ভাবও তত বেশী ঘটিতে থাকে। সব চেয়ে প্লীহা ও অস্থিমজ্জায় ইহার আধিক্য ঘটে।

আমার আক্রমণে রক্তাল্পতার ফল চর্ম্মরোগ। খোষ, পাঁচড়া, দদ্রু, স্ফোটক, কর্ণমূল, উরুস্তম্ভ ও পৃষ্ঠব্রণ প্রভৃতি রোগগুলিকে রক্তাল্পতা ঘটাইয়া আমি টানিয়া আনিয়া থাকি। আমি আক্রমণ করিয়া অনেকদিন থাকিলে হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। হৃৎপিণ্ডের থলিগুলি বড় হয় এবং শক্তিহীন হয়। ইহার ফল হইতেছে—রোগীর হাত পা ফুলা, উদরী ও সর্ব্ব শরীরে শোথ রোগ উৎপন্ন হওয়া।

আমি যখন রোগীকে খুব জখম করিয়া ফেলি, তখন রোগীর দেহে রক্ত নাই বলিয়াই অনুমান হয়, প্লীহা নাভিদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে, যকৃৎও বড় হয়। এই সকলের পরিণতি হইতেছে—ক্ষুধামান্দ্য, অতীসার, অজীর্ণ, উদরাময়। এখন যে দেশে যক্ষ্মা ও ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগ প্রবলভাব ধারণ করিয়াছে তাহারও অন্যতম কারণ আমি। আমিই রোগীকে রক্তশূন্য করিয়া তাহার শেষ ফল ঐরূপে ঘটাইয়া থাকি।

বর্ষা ও শরৎ কালেই আমি আমার প্রভাব বিস্তারের বেশী সুবিধা পাইয়া থাকি।

শীতকালে আমি একটু কাবু হইয়া পড়ি, বসন্ত ও গ্রীষ্ম কালেও আমার প্রভাব বিস্তারের বড় সুবিধা হয় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ৫৫০ জন আমা কর্ত্তৃক আক্রান্ত রোগীর রক্ত পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তাহাতেও ইহাই প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। মেডিকেল কলেজের ডাক্তারগণ পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট দিয়াছিলেন, ঐ ৫৫০ জনের মধ্যে অর্দ্ধেকগুলিকে আমি শরৎ ও হেমন্ত কালেই আক্রমণ করিয়াছিলাম। ঐ রিপোর্টে তাঁহারা জানাইয়াছিলেন, বসন্ত কাল হইতে শরতের আরম্ভ কাল পর্য্যন্ত এক শত জনের মধ্যে নাকি আমি মাত্র ২০ জনকে আক্রমণ করিয়া থাকি। সে কিন্তু অনেক দিনের কথা। এখন যদি মেডিকেল কলেজে আবার এ বিষয়ের পরীক্ষা করা হয়—তাহা হইলে এখন বারমাসই আমি যে লোকের পিছনে লাগিয়া থাকি—এটা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

এঁটেল মাটির দেশেই আমার বিস্তৃতি লাভের বেশী সুবিধা হয়, কারণ সে সব দেশে বর্ষার জল সহজেই জমে। সেই জলে আমার জীবাণু জন্মিবার ও তাহাদের বিস্তৃতি লাভের বিশেষ সহায়তা করে। যদি খাল কাটিয়া সে জল গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার বন্দোবস্ত হয় তাহা হইলে আমি সে স্থানে আর বড় তিষ্টিতে পারি না।

আমার জীবাণুগুলি পরব্রূহ উদ্ভিদ শ্রেণীর অন্তর্গত, মানব শরীরে রক্ত কণিকার ভিতরে ইহারা অবস্থিতি করে। ইহাদের রূপ—দণ্ডে দণ্ডে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। মশক শরীরে প্রথমতঃ আশ্রয় স্থল করিয়া লইয়া তাহার পর ঐ মশক দংশনের সাহায্যে ইহারা মানব শরীরে প্রবেশের সুবিধা পায়। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে ডাঃ ম্যানসন এ রহস্য সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করেন। ১৮৯৭—৯৯ খৃঃ অব্দে ডাঃ রসও ইহার সমর্থন করেন। লণ্ডনে যখন আমি আদৌ গমন করি নাই—তখন এই বিষয় প্রমাণের জন্য আমা কর্ত্তৃক বিজিত দেশ সকল হইতে কয়েকটি মশককে লণ্ডনের ডাক্তারেরা লইয়া গিয়া কয়েকজন সাহেবকে দংশন করাইয়া ইহার প্রমাণ পাইয়াছিলেন। দংশন মাত্রেই আমি তাহাদের উপর পূর্ণ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হই। ইটালীতে যখন আমার প্রাদুর্ভাব খুব বেশী, তখন ডাঃ লো ও সামবিল সেখানে লোহার তারের জাল দিয়া ঘেরা বাড়ীতে বাস করার ফলে মশকেরা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে নাই, কাজেই তাঁহাদের উপর আমার প্রভাব বিস্তারের সুবিধাও ঘটে নাই।

মশক মাত্রেই যে আমার জীবাণু বহন করিয়া বেড়াইতেছে এমন নহে, তাহা হইলে তো আমার কম সুবিধা হইত না, সমগ্র পৃথিবীর লোককেই একেবারে ভক্ষণ করিতে পারিতাম। Anopheles নামক যে মশক—তাহারাই আমার জীবাণুবাহী। তবে অন্যান্য মশকেরাও আমার জীবাণু বহন না করিলেও আরও অনেক রোগের জীবাণু বহন করিয়া থাকে। যেমন এক শ্রেণীর মশক আছে তাহারা আফ্রিকার পীত জ্বরের জীবাণু বহন করিতেছে। আরও কতকগুলি মশক আছে তাহারা গোদ, বাতশিরা প্রভৃতির জীবাণু মানব শরীরে ঢালিয়া দিতেছে।

আসল কথা—হইতেছে মশক কুলের

সাহায্যেই আমি বাঙ্গালা দেশে আধিপত্য বিস্তারের বিশেষ সক্ষম হইতেছি। পল্লীগ্রামে যে আমার আধিপত্য বেশী—তাহার কারণ পল্লীগ্রামের অধিকাংশ ভূমি বর্ষায় সিক্ত থাকে, বসত বাটীর চতুঃপার্শ্বেই বনরাজির বিস্তৃতি—অনেক খাল, বিল, পুষ্করিণী কর্দ্দম পঙ্কিল ও রুদ্ধ প্রায়, কাজেই আমার জীবাণু-বাহী মশক বংশের বিস্তৃতির সেখানে যেমন সুবিধা, এমন আর সহরে নহে। কৃষক সম্প্রদায়ের উপর আমার যে প্রভাব বিস্তারের অধিক সুবিধা, তাহার কারণ তাহারা অনাবৃত দেহে সর্ব্বদাই অবস্থিতি করে, রাত্রেও তাহারা মশারি ব্যবহার করে না, কাজেই তাহাদিগকে আক্রমণ করাটা অতি সহজ ব্যাপার। এখনকার দিনে দেশে যে শিশু মৃত্যু বাড়িয়া উঠিয়াছে. তাহারও অনেকটা কারণ আমি। বাঙ্গালীর শিশুরা প্রায়ই উলঙ্গ দেহে সর্ব্বদা খেলা ধূলায় মত্ত থাকে, আমার জীবাণুবাহী মশকেরাও সে জন্য তাহাদের দংশনের সুবিধা পায়। বাঙ্গালী মহিলারাও এখনকার দিনে বেশী মরিতেছে এই জন্য। ইহার প্রধান কারণ আমার জীবাণুবাহী মশকগণ মানব শরীরে আবিষ্ট হইলেও যদি আর কতকগুলি জিনিসের সহায়তা আমি না পাই, যেমন জলে ভেজা, ঠাণ্ডা লাগান, দুষ্পাচ্য ও বাসি দ্রব্য আহার প্রভৃতির প্রশ্রয় দেওয়া না হয়—তাহা হইলে আমি সব সময় সকলকে আঁটিয়া উঠিতে পারি না। বাঙ্গালী মেয়েদের এবং পল্লীগ্রামের কৃষককুলের এ গুলি কিন্তু অনেক কারণেই না করিলে নয়,—আমার আক্রমণও সেইজন্য তাহাদের উপর বেশী।

আমার সহিত আঁটিয়া না উঠায় এখন অনেকে দেশত্যাগী হইয়াছেন। এক কথায় বাঙ্গালার পল্লীগুলিকে আমি একেবারে শ্রীহীন করিয়া তুলিয়াছি। যাঁহারা জমীদার বা অবস্থাপন্ন, তাঁহারা তো আমার ভয়ে দেশে থাকিতেই চাহেন না, যাঁহারা চাকরি করিয়া ও জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারাও আমার ভয়ে এখন সপরিবারে দেশত্যাগী। পুষ্করিণী-দীঘিকার সোপান তলে আর সে কামিনী কুলের অলঙ্কার শিঞ্জনে শ্রুতিসুখ অনুভব হয় না, শিশুদিগের কলরব, যুবকদিগের অট্টহাস্য এবং স্থবিরগণের বৈঠক—মজলিসে তাস পাশার হারজিতের সহিত পরকুৎসা পরগ্লানির গালগল্পও শুনিতে পাওয়া যায় না। কোনো কোনো গ্রামে বৎসরান্তে পূজার সময় কতকগুলি লোকের সমাবেশ হয় বটে, কিন্তু কিছুদিন থাকিয়াই তাঁহারা আমার দ্বারা এরূপ আক্রান্ত হন যে, চাকরির ছুটী ফুরাইবার অনেক আগেই তাঁহাদিগকে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হয়। আমার জন্য অনেক পল্লীগ্রামেরই এখন এই অবস্থা। যাহাদের অন্য উপায় নাই, যাহারা চাকরি-জীবি নহে, সহরপ্রবাসীদিগের জন্য গ্রীষ্মের কাট ফাটা রৌদ্র, বর্ষার অবিরাম বারিধারা এবং শীতের হাড়ভাঙ্গা যন্ত্রণা সহ্য করিয়া যাহারা পল্লীপ্রান্তরে শস্য উৎপাদনে অন্নের সংস্থান করিয়া দিতেছে, তাহারাই এখন পল্লী ভিটায় সন্ধ্যা জ্বালিয়া পল্লীর স্মৃতি রক্ষা করিতেছে মাত্র। আমার আক্রমণ এখন তাহাদিগেরই উপর।

আমাকে তাড়াইবার জন্য অনেকে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে সব দেশে ইহার জন্য

যেরূপ তোড়জোড় করা হইয়াছিল সে সব দেশ হইতে আমি পলাইয়া আসিয়াছি। হংকং, হ্যাভেনা এবং ইস্‌ম্যালিয়া হইতে আমি তাহাদের যন্ত্রণায় পলাইয়া আসিয়াছি। মালয় পেনিনসুলার Klang হাসপাতালে আমাকে তাড়াইবার জন্য আয়োজন করার পর আমি যেরূপে সেখান হইতে পলাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম—গবর্ণমেণ্ট তাহার নিম্ন লিখিতরূপ হিসাব রাখিয়াছেন, ১৯০১ সালে আমার আক্রমণ হইয়াছিল ৬১০ জনের উপর, ১৯০২ সালে ১৯৯, ১৯০৩ সালে ৬৯, ১৯০৪ সালে ৩২ এবং ১৯০৫ সালে ২৩। হংকংয়ে ১৯০০ সালে ১২২০, ১৯০১ সালে ১২৯৪, ১৯০২ সালে ৭৫২, ১৯০৩ সালে ৫৬ ১৯০৪ সালে ৪৩৩ ও ১৯০৫ সালে ৪১৯। হ্যাভা-নায় ১৯০০ সালে ৩৪৪, ১৯০১ সালে ১৫১, ১৯০২ সালে ১৭৭, ১৯০৩ সালে ৫১, ১৯০৪ সালে ৫৪, ১৯০৫ সালে ৩২, ১৯০৬ সালে ২৬।

এরূপ অবস্থায় আমি যতবড় দুরন্তই হইনা কেন, চেষ্টা করিলে আমাকে দমন করা যে যায় না এমন নহে। পল্লীগ্রামের খাল-বিল-ডোবা গুলির যদি সংস্কার সাধন করা হয়, যে সকল স্থানে পগার গর্ত্ত হইয়াছে, সেগুলি যদি বুঁজাইয়া ভরাট করিয়া দেওয়া হয়, বাড়ীর পার্শ্বস্থ বন জঙ্গল গুলি যদি প্রতি বৎসর কাটিয়া ফেলা হয়, বর্ষার সময় যদি পানীয় জল গরম করিয়া তাহাতে কর্পূর ও নির্ম্মলী ফল ফেলিয়া রাখিয়া পান করার ব্যবস্থা করা হয়, যে জলাশয়ের জল পানার্থ ব্যবহৃত হয়, তাহাতে বা তাঁহার ধারে মল মূত্র পরিত্যাগের ব্যবস্থার অপনয়ন করা হয়, পান করিবার জলাশয়গুলিতে বর্ষার সময় পাট পচানর ব্যবস্থা যাহা অনেক স্থলেই চলিয়া আসিতেছে—তাহা যদি একেবারে রহিত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমাকে দূর করা খুব বেশী কথা নহে। সরকার বাহাদুর অবশ্য এজন্য চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু দেশের লোকেরও চেষ্টা করা চাই। কিন্তু সে চেষ্টা করিবে কে? যাহারা দেশে থাকে তাহাদের কথা ত বলিয়াছিই, তাহাদের সঙ্গতির অভাব। সে চেষ্টা যাঁহারা করিতে পারেন তাঁহারা আমার নাম শুনিয়াই ভয়ে বিদেশবাসী। সরকার বাহাদুরের যত্ন ও চেষ্টার সহিত যদি তাঁহাদের যত্ন ও চেষ্টা মিলিত হয়, তাহা হইলে আমার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বচন-সর্ব্বস্ব বাঙ্গালীর মধ্যে সে চেষ্টা কোনও কালেই হইবে না, অতএব আমি নিশ্চিন্ত।

আমাকে তাড়াইবার আরও কতকগুলি সহজ উপায় আছে। ধূপ ধুনার গন্ধ আমার জীবাণুবাহী মশকেরা সহ্য করিতে পারে না, এজন্য প্রতিদিন সকালে-সন্ধ্যায় প্রত্যেক গৃহে ধূপ ধুনার ধূম প্রদান করিলে সে গৃহে আমার প্রভাব কমিয়া আসে। কৃষ্ণচূড়া ফুলের গাছও আমার শত্রু। উহার এমন শক্তি আছে যে, সিক্ত ভূমি শুষ্ক করিয়া তুলে, এজন্য যে বাটীতে কৃষ্ণচূড়া ফুলের গাছ রোপণ করা হয়, সে বাটীতেও আমার প্রভাব হ্রাস পাইয়া থাকে। ইউরোপীয় চিকিৎসা বিদ্যা-বিশারদ ডাঃ হেগুলী বলেন,—জটামাংসী ও চন্দ্রমল্লিকার মুকুল চূর্ণ করিয়া ধুনার মত উহাতে অগ্নিদান করিলেও আমার জীবাণু-বাহী মশকের বংশক্ষয় প্রাপ্ত হয়। আকর-করা এবং গন্ধকের ধূমেও মশক তিষ্টিতে পারে না। পল্লীগ্রামে এখনও কোনও

কোনও স্থলে সন্ধ্যার সময় একবার করিয়া ধুপ ধুনা প্রদানের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু যেরূপ ভাবে জানালা-দরজা বন্ধ করিয়া উহা প্রদান করিলে মশকদিগের অনিষ্ট হইতে পারে, সেরূপ ব্যবস্থা অনেকেই করেন না, কাজেই তাহাতে কোনও ফললাভও হয় না।

অনেকে বলেন কুইনাইন আমার পরম শত্রু। হইতে পারে তাঁহাদের কথা সত্য, কিন্তু যদি আমার সহিত অন্য জ্বরের ভুল হয় তাহা হইলে কুইনাইনে ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টই হইয়া থাকে। কবিরাজী নাটার ফল চূর্ণ করিয়া আমাকে সেকালের কবিরাজ মহাশয়েরা দমন করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহাতে মন্দ ফল হইত না, এখন সে হাঙ্গামা আর বড় একটা কেহ করিতে চাহেন না, কাজেই আমি বাঁচিয়া গিয়াছি। কবিরাজী হরিতাল ঘটিত ঔষধও আমার পরম শত্রু। আমি আক্রমণ করিয়া সব সময় ত পূর্ণ প্রভাব দেখাই না, প্রাতঃকালে সাধারণতঃ মানব শরীর হইতে আমি ছাড়িয়া থাকি, সে সময় হরিতালঘটিত ঔষধ খাইলে আমার তাহাকে আক্রমণ করিবার সম্ভাবনা থাকে না। এক দিনে ঐরূপ করিয়া আমাকে জব্দ করিতে না পারিলেও ২।৩ দিন ঐরূপ করিলেই আমাকে সে ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিতে হয়। কবিরাজী 'মকরধ্বজের' সহিত 'হিঙ্গুলেশ্বর' মিশাইয়াও অনেকে আমাকে পরাস্ত করিয়াছেন। যাঁহারা ঐ ঔষধ দিয়া আমাকে জব্দ করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা প্রাতঃকালে আমি ছাড়িয়া গেলে কুইনাইনের মত ২ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টা অন্তর দিনে ২ বার উহা সেবন করিবার ব্যবস্থা দেন। ঐরূপ ২।৩ দিন করিলেই আমাকে সে ব্যক্তিকে না ছাড়িলে উপায় নাই।

সিউলি পাতার রসও আমার পরম শত্রু। যে সময় আমার আক্রমণের প্রাদুর্ভাব, সে সময় যদি দেশের লোকে সিউলিপাতার রস—খালি পেটে দিনে ১ বার করিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে তাহাদের উপর আমার আক্রমণ করিবার সম্ভব নাই। যাহাদিগকে আমি খুব জোরে আক্রমণ করিয়া থাকি—তাহারা ঐ সিউলীপাতা, ক্ষেতপাপড়া ও গুলঞ্চ এক একটি এগার আনা ওজনে লইয়া বেশ করিয়া থেঁতো করিয়া কলার পাতায় জড়াইয়া আগুনের উপর চাটুতে অল্প সেঁকিয়া লইয়া সমস্ত রাত্রি শিশিরে রাখিয়া প্রাতঃকালে যদি তাহার রস সেবন করেন, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে সহজে ছাড়িয়া থাকি। কবিরাজী ভার্গ্যাদি পাচনেও আমি অনেক সময় ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়া পলাইয়া থাকি; কিন্তু এ সকল ব্যবস্থা এখন করিতেছে কে? দেশে যে কুইনাইনে ভরা পেটেণ্ট ঔষধের ছড়াছড়ি! লোকে তাহাই খাইয়া আমাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। ফলে আমি সে সকল ঔষধে তখনকার মত ছাড়িয়া যাইলেও একটু অত্যাচারের ফাঁক পাইলেই আবার তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেছি।

আমাকে দমন করিবার জন্য সকল দেশের চিকিৎসক মহাশয়েরা সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু অনেক সময়ই ভুল করিয়া বসেন। আমার মত আর একটি ভয়ঙ্কর রোগ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার

নাম কালাজ্বর। সেই কালাজ্বরের সহিতই অনেক সময় আমার সহিত চিকিৎসকেরা ভ্রম ঘটাইয়া থাকেন। আমার সহিত কালাজ্বরের ভেদ-নির্ণয় করিতে হইলে এই গুলির প্রতি লক্ষ্য করা উচিত। যথা—আমি যাহাকে আক্রমণ করি, তাহার নির্দ্দিষ্ট সময়ে বা পালা করিয়া জ্বরের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। কালাজ্বরে আক্রান্ত হইলে জ্বর অনেক দিন ধরিয়া চলিতে থাকে, কিন্তু জ্বর ছাড়িবার বা বাড়িবার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম থাকে না। আমার আক্রমণে প্লীহা বড় হয়, কিন্তু যকৃৎ খুব বড় হয় না। কালাজ্বরে আক্রান্ত হইলে প্লীহা ও যকৃৎ দুইই খুব বড় হয়। আমি আক্রমণ করিলে রোগী খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়ে না, অনেক সময় কাজ কর্ম্মও করে, আবার রোগ ভোগও করে। কালাজ্বরে আক্রমণ করিলে সকল সময়েই দুর্ব্বলতা অধিক অনুভব হয়। আমার আক্রমণে দ্বৈকালীন জ্বর খুব কম স্থলেই হইয়া থাকে, কিন্তু কালাজ্বরের আক্রমণে দ্বৈকালীন অবিরাম জ্বর অনেকস্থলেই হইয়া থাকে। আমার আক্রমণে লোকে ভয়ে কাঁপিতে থাকে, কালাজ্বরে সব সময় সেরূপ ঘটেনা। আমার ও কালাজ্বরের বিশেষত্ব আমি প্রায়ই অপরাহ্ন কালে বা রাত্রিতে আক্রমণ করিয়া থাকি, কালাজ্বরের আক্রমণ প্রায়ই প্রাতঃকালে। ডাক্তারেরা রক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, আমার আক্রমণে রক্ত ও শ্বেতকণিকা উভয়ই সমান ভাবে ধ্বংস হইয়া থাকে, কিন্তু কালাজ্বরে শ্বেত কণিকাই বেশী নষ্ট হয়। ডাক্তারেরা কুইনাইন দিয়া আমাকে জব্দ করিতে পারেন, কিন্তু কালাজ্বরের নিকট কুইনাইন সম্পূর্ণ পরাস্ত।

অনেক চিকিৎসক যক্ষ্মার সহিতও অনেক সময় আমার ভুল করিয়া বসেন। ফলকথা আমি যে দেশে এত লোকক্ষয় করিতে পারিতেছি ইহা অনেকটা চিকিৎসা বিভ্রাটেও। যদি দেশ হইতে আর্সেনিক ও কুইনাইনঘটিত পেটেণ্ট ঔষধগুলা উঠিয়া যায়, তাহা হইলে আমার আর অসুবিধার সীমা থাকে না, কারণ উহারা আছে বলিয়াই আমি যে একবার দমিত হইলেও পুনঃ পুনঃ আক্রমণের সুবিধা পাই সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমার আরও একটা সৌভাগ্য যে, সেকালের মত বিচক্ষণ বৈদ্য এখন দেশে বিরল, নতুবা আমার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিলে উপযুক্ত চিকিৎসায় আমাকে অনেক দিন পূর্ব্বেই যে বাঙ্গালা দেশ হইতে বিতাড়িত হইতে হইত, তাহার আর সন্দেহ নাই।

Cold বা ঠাণ্ডা লাগা।

(শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস)

আমাদের দেশ গ্রীষ্ম প্রধান; কখনও গরমের জন্য, কখনও বা অর্থাভাবে গাত্রবস্ত্র জুটাইতে পারিনা বলিয়া, অনেক সময় আমরা নগ্নগাত্রে হাওয়া লাগাইতে বাধ্য হই। বারান্দায়, প্রাঙ্গনে বা ছাদের উপর—অনাবৃত স্থানে নিদ্রা যাই। সুতরাং ঠাণ্ডা লাগিয়া

যে রোগ হইতে পারে—এ ধারণা আমাদের অনেকেরই নাই। শীতের সময় আমরা কিছু কিছু শৈত্যের ভয় করি বটে, কিন্তু তত বেশী সাবধান হইনা। আমাদের দেশের সকল স্থানে, সকল জেলায়—সমান ভাবে শীতও পড়েনা। কোথাও গ্রীষ্মকালে দারুণ গরম, কোথাও কম; কোথাও শীতের সময় সাংঘাতিক শীত, কোথাও বা শৈত্যের বেগ সামান্য। বিভিন্ন প্রদেশে শীতাতপের এইরূপ বিভিন্নতা। আমরা ঠাণ্ডার মর্ম্ম বুঝিনা, ঠাণ্ডাকে ভয়ও করিনা; তথাপি আমাদের ঠাণ্ডা লাগে, ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগও হয়। অতএব ঠাণ্ডা লাগানোর কথাটার একটু আলোচনা করিয়া রাখিলে,—নিতান্ত মন্দ হয় না।

কিন্তু ঠাণ্ডার কথা বলিতে গেলে, উত্তাপের কথাও বলিতে হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে—মানবদেহে তিনটী উত্তাপের কেন্দ্র আছে। যথা—১। উত্তাপজনন কেন্দ্র (Thermogenesis) ২। উত্তাপ হরণ কেন্দ্র (Thermolysis) ৩। উত্তাপ ব্যবস্থাপক কেন্দ্র (Thermotaxis); এই কেন্দ্রত্রয়ের মধ্যে প্রথমটীর কার্য্য—ক্রমাগত উত্তাপ উৎপাদন; দ্বিতীয়টীর কার্য্য—ক্রমাগত উত্তাপ নষ্ট করা; তৃতীয়টীর কার্য্য—আবশ্যক মত দেহের উত্তাপ রক্ষা। অর্থাৎ অধিক উত্তাপ হইলে তাহা বাহির করিয়া দেওয়া এবং উত্তাপ কমিয়া গেলে উত্তাপের সৃষ্টি করা। ত্বক্, শ্লৈষ্মিকঝিল্লী এবং দেহের অভ্যন্তরে স্থিত যন্ত্রগুলি—সদাসর্ব্বদা স্বস্ব কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া উত্তাপ উৎপাদন করে। এই দৈহিক উত্তাপ প্রকারান্তরে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে পরিণত হয়। ইহাদের কেন্দ্র ও ভিন্ন ভিন্ন। তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়; (ক) মস্তিষ্কস্থিত উত্তাপ কেন্দ্র। (খ) স্পাইনাল কর্ড ও মেডুলাস্থিত ঘর্ম্মকেন্দ্র। (গ) মস্তিষ্কের Pons এ স্থিত এবং Spinal cord এ স্থিত পৌষ্টিক কেন্দ্র (trophic centre) (ঘ) শিরা সঞ্চালক কেন্দ্র (Vasomotor centre) (ঙ) হৃদ্‌পিণ্ডের কেন্দ্র, (চ) শ্বাস-প্রশ্বাস কেন্দ্র, (ছ) মূত্রাশয়ের কেন্দ্র; (জ) দেহের ভিতরকার যন্ত্রাদির কেন্দ্র।

"ঘর্ম্মকেন্দ্র" আবশ্যক মত ঘর্ম্ম গ্রন্থিকে উত্তেজিত ও অবসন্ন করে। এইরূপে উত্তাপের অল্পাধিক্য বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র হইতে শোণিত চাপ (Blood pressure) ঘর্ম্ম, মূত্র, শ্বাসক্রিয়া, প্রভৃতির কার্য্যে—কখনও উত্তেজিত, কখনও বা অবসন্ন হইয়া থাকে। তাহার দ্বারাই দৈহিক উত্তাপ সম্যক্ রক্ষিত এবং জীবনী সক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে।

পাঠক হয়তো মনে করিতেছেন—"ঠাণ্ডা লাগার" আলোচনা করিতে গিয়া, এত Physiologyর বিচার কেন?" কিন্তু উত্তাপ না বুঝিলে শৈত্যের মর্ম্ম গ্রহণ কখনই সহজ কার্য্য নহে। সুতরাং এরূপ আলোচনাকে নিতান্ত নিরর্থক বলা যায় না।

কোন কোন বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস—শৈত্য হইতে কোন রোগ জন্মিতে পারে না। ইহাঁরা স্বমত সমর্থনের জন্য এই যুক্তি দেখান—একত্রে একদিনে, একই সময়ে এক অবস্থাপন্ন কয়েক ব্যক্তি যদি শৈত্য উপভোগ করে, তাহাদের সকলের কি একই রোগ হয়? তবে শৈত্যের রোগজনন-শক্তি স্বীকার করিব কেন? কিন্তু আমার মনে হয়—শৈত্য

(ঠাণ্ডা লাগা) রোগের মুখ্য কারণও না হউক, অনেক স্থলে গৌণ কারণ বটে। সকলেই জানেন—শৈত্যবশতঃ; শরীরের নৈসর্গিক রোগ প্রতিরোধ শক্তি (Natural resistance) যখন কমিয়া যায়, তখন বাহির হইতে যে কোনও রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে। এই জন্যই আমি ঠাণ্ডা লাগাকে অনেক রোগের গৌণ কারণ বলিয়াছি।

ব্যক্তি বিশেষের, দুর্ব্বল স্থান ভেদে—এক ঠাণ্ডা লাগা হইতে ভিন্ন ভিন্ন রোগ জন্মিতে পারে। যাহাদের শ্বাসযন্ত্র দুর্ব্বল—ঠাণ্ডা লাগিলে, তাহাদের ফুসফুস প্রদাহ (নিমোনিয়া) হয়। যাহাদের নাসারন্ধ্র পথ ক্ষীণবল, তাহাদের প্রতিশ্যায় (সর্দ্দি) এবং দুষ্ট প্রতিশ্যায় (ইনফ্লুয়েঞ্জা) হইবার সম্ভাবনা। যে ব্যক্তির শারীরিক সন্ধি সমূহ দুর্ব্বল, তাহার "গ্রন্থিবাত", যাহাদের অন্ত্র দুর্ব্বল তাহাদের "উদরাময়" হইতে পারে। এই ঘটনা হইতে বেশ বুঝা যায়—শৈত্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রোগোৎপাদনের কারণ না হইলেও, শরীরের স্থান বিশেষকে এত দুর্ব্বল করিতে পারে যে, সেই স্থানে অনায়াসেই রোগ-জীবাণু আশ্রয় লাভ করিতে সক্ষম হয়। এমন কি ঠাণ্ডা লাগিয়া, মানুষের সমস্ত দেহই রোগগ্রস্ত হইতে পারে।

কেহ কেহ বলেন—শীত হইতে শরীর রক্ষার জন্য ত্বকই মানবের প্রধান অস্ত্র। এ কথা কিন্তু সকল দেশের লোকের সম্বন্ধে খাটে না। অনেক দেশেই শৈত্যের হস্ত হইতে দেহ রক্ষা করিবার জন্য পোষাক পরিচ্ছদের সাহায্যে অঙ্গ আবৃত করিতে হয়। কিরূপ শীতে কিরূপ অঙ্গাবরণের প্রয়োজন—তাহার নির্দ্দেশ অসম্ভব। কেননা—শীতাতপ বোধ, সকল ব্যক্তির সমান নহে। সাধারণতঃ—অতি বৃদ্ধ, শিশু এবং কৃশকায় ব্যক্তিগণ—বেশী ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহাদের শীতানুভবশক্তি অধিক। ঠাণ্ডা লাগিলে, ইহঁাদের রোগও হয়।

শীত প্রধান দেশের লোক—তুষার-স্ফীতি বা তুষারক্ষত রোগে অনেক সময় ভুগিয়া থাকেন। এই রোগের ইংরাজী নাম frost bite বা chilblain.। আমাদের দেশেও শীতে কাহারও পা ফাটে, কাহারও ফোলে, কাহারও শরীরে নানাবিধ চর্ম্ম রোগ দেখা দেয়। কাহারও বা পক্ষাঘাতও হইয়া থাকে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—ঠাণ্ডা লাগিলে যদি এত রোগ হয়, তবে ঠাণ্ডার হাত হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? স্বয়ং প্রকৃতি জননীই উহার উপায় করেন। বহির্বায়ু যতই শীতল হউকনা কেন, শ্বাসক্রিয়ার সঙ্গে সুস্থ দেহে প্রবেশ করিবার পথে—সে বায়ু উষ্ণত্ব প্রাপ্ত হয়; সেই উষ্ণ অবস্থায় ফুসফুসেও প্রবেশ করে। নাসরন্ধ্রে যে সকল ক্ষত (sinus) আছে, তাহার ভিতর দিয়া প্রবেশ করিবার সময় শীত বায়ু উষ্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। নহিলে, তাহার প্রবেশাধিকার থাকে না। এই জন্যই যে সকল শিশুর নাসারন্ধ্রের পশ্চাতে কোন রকম প্রতিবন্ধক থাকে, তাহাদের ফুসফুসে প্রবেশ করিবার সময় বায়ু যথাযোগ্য উত্তপ্ত না হওয়ায়, সেই সকল শিশু প্রায়ই ফুসফুসের রোগে কিম্বা কণ্ঠনালীর রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

ত্বক্ ও ফুসফুস শৈত্য বশতঃ রোগগ্রস্থ হইতে পারে। অন্যান্য শারীর যন্ত্রও পীড়িত

হইতে পারে। এই সকল শারীর যন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্য দুইটী শারীর ক্রিয়ারও পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ ক্রিয়া দুইটীর নাম "প্রতিক্রিয়া (Reaction)" এবং "প্রতিরোধ (Counter-aetion)" প্রথমটী অর্থাৎ "প্রতিক্রিয়া" আর কিছুই নহে—পূর্ব্ব বর্ণিত সেই Thermoyenesis; দ্বিতীয়টী (প্রতিরোধ) প্রকারান্তরে—Thermotaxis বা উত্তাপ ব্যবস্থা। শরীরের কোন স্থানে কিম্বা সকল স্থানে অধিক ঠাণ্ডা লাগিলে Reaction এর ফলে, বাহিরের শৈত্যের অনুপাতে শরীরের আভ্যন্তরিক উত্তাপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। counter action বা প্রতিরোধ শক্তির আমরা ঘর্ম্ম বন্ধ, ত্বাচিক শোণিত সঞ্চালনের হ্রাস প্রভৃতি ক্রিয়ায় দেখিতে পাই। বাহিরের শীত যতই বেশী হউক না কেন—পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া দুইটীর জন্য দেহের উত্তাপ ও স্বাস্থ্য বজায় থাকে। কিন্তু এমন শীতও এমন দেশ আছে, যেখানে প্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধ শক্তি সহজেই পরাজিত হয়। সে ক্ষেত্রে মানুষ বাঁচিতেই পারে না, তাহার জীবন স্পন্দন—শৈত্য প্রভাবেই জন্মের মত স্থির হইয়া যায়।

প্রকৃতি-প্রেরণায় মানুষ শীত সহ্য করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। শরীরের এক স্থানেই হউক অথবা সকল স্থানেই হউক, ঠাণ্ডা লাগিলে প্রতিক্রিয়ার ফলে—বাহিরের শৈত্যের অনুপাতে দেহের আন্তরিক উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। বাহিরের শীত যতই বেশী হ'ক না কেন, ভিতরের উত্তাপ তাহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে। কিন্তু যদি দৈবাৎ মানব দেহের উত্তাপ ব্যবস্থাপক কেন্দ্র (Thermolaxis) বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে—তাহা হইলে ঠাণ্ডা লাগিয়া সে দেহ নিশ্চয়ই অসুস্থ হয়। দুঃখের বিষয়—এই "ঠাণ্ডা" কখন কেমন করিয়া "লাগে"—অনেক সময়েই তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এই জন্য আমাদের চিকিৎসা সাধারণতঃ নিরোধক (Preventive) এবং যে স্থলে উহা আরোগ্যজনক (Curative) সে স্থলেও উহা প্রকারান্তরিক (Inclinect) তাই আমরা শৈত্যকর্ত্তৃক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে আচ্ছাদন, আশ্রয়, এবং শীত স্থান হইতে স্থানান্তরিত করিয়া উত্তাপের ব্যবস্থা করিয়া বসি। রোগীর বয়স, লিঙ্গ, বংশগত রোগপ্রবণতা, ক্ষীণতা, ঋতু, দেশ, প্রকোপ প্রভৃতি দেখিয়া শুনিয়া সুচিকিৎসকগণ—ভিন্ন ঋতুতে, ভিন্ন দেশে রোগীকে বায়ু পরিবর্ত্তনের উপদেশ দিয়া থাকেন।

দরিদ্রগণ—দুই মুঠা খাইতে পাইলে শীতকে আদৌ গ্রাহ্য করে না, তাহাদের তত ঠাণ্ডা লাগার ভয় নাই। ধনীদের অনুকরণ করিয়া এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার অযথা উপলব্ধি বশে—আমাদের দেশের সাধারণ গৃহস্থগণ এরূপভাবে শিশুগুলিকে লালন পালন করেন, যাহাতে তাহারা শৈশব হইতে যৌবনে পা দিয়াও—বারমাস নানা রোগে ভুগিয়া থাকে। বাবুধর্ম্মীগণ—শীতকালে প্রায় অষ্ট প্রহর মোজা পায়ে দিয়া থাকেন, ফ্লানেলের জামা, কমফর্টার, টুপি প্রভৃতি নানা রঙ্গের আবরণে আত্মগোপন করেন; সকালে শয্যা ত্যাগ করিতে পারেন না, শয়নগৃহে বায়ুপথ রোধ করিয়া সারা রাত্রি আলো জ্বালিয়া রাখেন, গরম জল না হইলে স্নান করিতে চাহেন না,—এই প্রকৃতির লোকেরাই ঠাণ্ডা লাগিয়া

সহসা অত্যুৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়েন। তখন দুই বেলা বাটীতে ডাক্তারের শুভাগমন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ সেবন,—তাঁহাদিগের শৈত্য নিবারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

বাঙ্গালায় একটা কথা আছে—

"রোদে পুড়ে, জলে ভিজে দেহ শক্ত কয়।
মার্কণ্ডের পরমায়ু মানব হ'য়ে রয়॥"

বাস্তবিক প্রত্যেক মানুষেরই উচিত, সহ্য সামর্থ্য, এবং অবস্থা বিবেচনায়—শীতাতপ সহ্য করিবার অভ্যাস রাখা। ইহাতে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগ হইতে পারে না, যাহারা এই উপদেশ ভুলিয়া যায়, নির্ব্বাত গ্রীষ্মকালেও তাহারা হাঁপানী বা ফুস্ফুস্ প্রদাহে কষ্ট পায়।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি নিম্নলিখিত কথা-গুলি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। যথা—

(ক) প্রত্যেক মানুষের শরীরেই যথা-যোগ্য উত্তাপ রক্ষার জন্য ৩টী কেন্দ্র আছে। তাহাদের দ্বারা ঘর্ম্ম, প্রস্রাব, শ্বাসপ্রশ্বাস এবং হৃদ্‌যন্ত্রাদির কার্য্য সম্পন্ন হওয়ায়—শীতাতপের সামঞ্জস্য হয়।

(খ) ঠাণ্ডা লাগিয়া—শরীরে রোগ প্রতিষেধক শক্তির হ্রাস হয়। সেই জন্যই মানুষের ব্যাধি জন্মে।

(গ) আমরা প্রাচ্য রীতি অনুসারে নগ্ন গাত্রে থাকি, অনাবৃত স্থানে বাস করি, কিন্তু পাশ্চাত্যের আদর্শে আমরা শিখিয়াছি, সদাসর্ব্বদা জামা মোজা পরিয়া থাকাই সভ্যতার চিহ্ন।

হায়! বলিতে পারি না, কবে আমরা ধীর প্রশান্ত ভাবে এই প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সামঞ্জস্য করিতে শিখিব?

ভেজালে বিপত্তি।

(বৈদ্যরত্ন কবিরাজ ৺কালীদাস বিদ্যাভূষণ)।

আমাদের দেশের দার্শনিক পণ্ডিতগণ, বহুযুক্তি দ্বারা নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন যে, জীব সকল যাহা কিছু ভোগ করে, তাহার মূল শুভাশুভ কর্ম্ম। শুভ কর্ম্ম জন্য সুখ, ও অশুভ কর্ম্ম জন্য দুঃখ। যে দুঃখ কেহ কামনা করে না, আক্ষেপের বিষয় সেই দুঃখই জীব-গণকে অধিক মাত্রায় ভোগ করিতে হয়। যদি সুখ দুঃখের কারণ অগ্রে নির্ণয় করা থাকিত, তবে আর জীব সকল সুখকামী হইয়া, কখনই বিপুল দুঃখ ভোগ করিত না। সুখার্থী হইয়া যাহারা পাপজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাদিগকে সুখের পরিবর্ত্তে পুনঃ পুনঃ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে—ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। পাপের পরিণাম দুঃখ, সেই দুঃখ পুনঃ পুনঃ ভোগ করিয়া, যাহারা পাপজনক কার্য্য করিতে শঙ্কাবোধ করে না, তাহাদিগকে বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তবে যাঁহারা এখনও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিয়া অধর্ম্মকর কার্য্য করিতে শঙ্কা বোধ করেন, এবং পুণ্যজনক কার্য্যে (গঙ্গাস্নান ও